

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর — শিল্পী শ্রীমুকুলচন্দ্র দে

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্মৃতি কথা

শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী

জিজ্ঞাসা ॥ কলিকাতা

প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৬৭

প্রকাশক
শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড
জিজ্ঞাসা । ১এ কলেজ রো । কলিকাতা ৯

মুদ্রক
শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
৩০ বিধান সরণী । কলিকাতা ৬

স্মৃতি-লেখকের নিবেদন

দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই স্মৃতিকথা স্মৃতিকথাই, তাঁর জীবনী লেখার বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করি নি। শান্তিনিকেতনে তাঁকে যখন যে-অবস্থায় দেখেছি স্মৃতি থেকে সে-সবের কিছুটা এই স্মৃতিকথায় সংগ্রহ করেছি।

স্মৃতিকথা ভেবে ভেবে প্রবন্ধ রচনার মতন ঠিক লেখা যায় না। এইজন্য দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে স্মৃতিকথা লেখবার দুর্বার অনুরোধের চাপে পড়ে, তাঁদের সঙ্গে আলাপ করেছি, পত্র ব্যবহার করেছি, যাঁরা তাঁর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন ও তাঁর সঙ্গলাভের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। আলোচনা এবং গল্প করতে করতেই, সহজভাবে স্মৃতির ভাণ্ডার আলোড়িত হয়ে ওঠে এবং সেই আলোড়নের ফলে অনেক চাপা পড়া স্মৃতি সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

এই রকমের স্মৃতিকথা লেখবার সময়েও এমন অনেক কথা মনে পড়ে যায় যার ফলে এক প্রসঙ্গের সঙ্গে অন্য প্রসঙ্গ মিশে যেতে চায়; সেই রকম ত্রুটি এই স্মৃতিকথায় অনিবার্যরূপে ঘটেছে। এক-একটা প্রসঙ্গকে ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে গুছিয়ে-সাজিয়ে লেখবার মতো স্বাস্থ্য-শক্তি আমার নেই— ষোল আনা গুছিয়ে লিখতে গিয়ে পাছে আট আনাও না লেখা হয় এই ভয়েই যেমন যেমন যা স্মরণে এসেছে, প্রসঙ্গক্রমের সংগতির সঙ্গে সে-সব স্মৃতি খাপছাড়া হলেও লিখেছি। দ্বিজেন্দ্রনাথের মানব-দরদী মনের দিককেই কেন্দ্র করে এই স্মৃতিকথা। কাজেই তাঁর এই-সব দিক যে-সব ঘটনায় প্রতিবিম্বিত হয়ে ওঠে সেই-সব ঘটনাবলীই প্রধান, কোনো ঘটনার সঙ্গে কোনো ঘটনার ক্রমিক ধারাবাহিকতার ব্যাপার গৌণ, ঘটনাই মুখ্য।

দ্বিজেন্দ্রনাথের দর্শনশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য, দর্শন সম্বন্ধে তাঁর মৌলিক চিন্তাধারা, তাঁর বাংলা ভাষায় জ্ঞানের অসাধারণত্ব, কাব্য-অলংকারশাস্ত্রে তাঁর সুগভীর জ্ঞান, ইত্যাদি বিষয় বঙ্গীয় সাহিত্যিক এবং সুশিক্ষিত বহু জনের কাছে সুবিদিত। এ-সব এই স্মৃতিকথার বর্ণনীয় বিষয় না হলেও, প্রসঙ্গক্রমে এ-সব বিষয় কিছু কিছু স্মৃতিকথায় অনিবার্যরূপে এসে পড়েছে।

এই নিবেদন শেষ করার পূর্বে আমার অকৃত্রিম ধন্যবাদ জানাই দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র স্বনামধন্য শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে— তিনি উৎসাহী হয়ে এই স্মৃতিকথা লিখতে আমাকে অনুরোধের পর অনুরোধে বাধ্য না করলে দুর্বল

স্বাস্থ্য নিয়ে এ কাজ আমি ইচ্ছে থাকলেও করতে পারতাম না। তাঁর সৌজন্যে পরিশিষ্টে মুদ্রিত হেমলতা দেবীর প্রবন্ধটি সংযোজিত হয়েছে।

পরিশিষ্টে মুদ্রিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের রচনাটি শ্রীব্রহ্মব্রত ভট্টাচার্যের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত হল।

প্রচ্ছদে মুদ্রিত নিচুবাংলায় ('দ্বিজ-বিরাম') দ্বিজেন্দ্রনাথ চিত্র শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী এবং গ্রন্থমধ্যে মুদ্রিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রনাথের সেবক মুনীশ্বর -এর রেখাচিত্র শিল্পী শ্রীমুকুল দে-র সৌজন্যে প্রাপ্ত।

পরিশেষে শ্রীপুলিনবিহারী সেনকে এই পুস্তক প্রকাশ ব্যাপারে নানা ভাবে সহযোগিতার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী

চিত্রসূচী

সূচনা

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। 'তত্ত্ববোধিনী সভা'-র প্রতিষ্ঠা ও এই সভা কর্তৃক ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র সম্পাদনা— বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে নবযুগের অরুণোদয়। বাংলার মানস-মৃত্তিকায় রামমোহন যে বীজ বপন করে গিয়েছিলেন সেই বীজ মহর্ষির জ্ঞান- ও -ত্যাগ-উদ্দীপ্ত সাধনায় বনস্পতি রূপে প্রকাশিত হল। ধর্ম, বিচার, কর্ম— এই তিনটি যে পরস্পর অচ্ছেদ্য বন্ধনে সংলগ্ন উনবিংশ শতাব্দীতে তার প্রথম প্রবক্তা হলেন রামমোহন। অন্ধ সংস্কারের কুহেলিকা থেকে বাঙালীর তথা ভারতবাসীর মনকে মুক্ত করবার জন্যে তিনি সাধনা করে গিয়েছিলেন। রামমোহন-নির্দিষ্ট সেই পথে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নেমে এসেছিলেন। তিনি রামমোহনের সাধনাকে কালোপযোগী রূপ দিয়ে তাকে বাঙালীর জীবনের অন্যতম অংশ করে দেবার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। বাঙালীর জীবনে নবযুগের চেতনা সঞ্চার করবার কাজে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'-র ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র অবদান অতুলনীয়।

তত্ত্ববোধিনী সভার সূচনার যুগে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম। অসামান্য প্রতিভাশালী দ্বিজেন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী সৃজনীশক্তি বিস্ময়কর। সতেরো বৎসর বয়সে তিনি 'মেঘদূত'-এর অনুবাদ করেন। তিন বৎসর পরে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এই অনুবাদ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 'মেঘদূত'-এর অনুবাদ পড়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখেছিলেন—

> আপন প্রশংস্য নম্রতা ও শালীনতার অনুরোধে অনুবাদক এই পুস্তকে আপন নাম প্রকটিত করেন নাই এই প্রযুক্ত আমরা তাঁহাকে বিশিষ্ট জ্ঞাত থাকিয়াও পাঠকদিগের নিকট তাঁহার পরিচয় দিতে পারিলাম না। পরন্তু তাঁহার সত্রপতার কোন বিশেষ কারণ নাই। যদিচ কালিদাসের অদ্বিতীয় কাব্যরস বঙ্গভাষায় রক্ষা করা প্রাগল্ভ্যের কর্ম বটে; তথাপি তিনি সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রমে যেরূপ সিদ্ধকাম হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বন্ধুরা অবশ্য ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতে পারেন।

অল্প বয়সেই দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর অনন্যসাধারণ কবিত্ব-শক্তিকে মনের কোণে নির্বাসিত করে তত্ত্বজ্ঞানচর্চায় আত্মনিয়োগ করলেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৬৯

খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি চার খণ্ডে 'তত্ত্ববিদ্যা' পুস্তক প্রকাশ করেন। ভারতীয় তত্ত্ববিদ্যা -সম্বন্ধীয় পুস্তক বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম রচনা করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র সম্পাদনা করেন সুদীর্ঘকাল। সেই সময়ে তাঁর লেখা অগুন্তি প্রবন্ধ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। সেই প্রবন্ধগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে— সোনার কাটি রূপার কাটি, উপনিষদ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞানের মূল্য নিরূপণ, বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের মূল্য নিরূপণ, কালের মূল্য নিরূপণ, সোনায় সোহাগা, আর্যামি এবং সাহেবিআনা, সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা, সাধনা— প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, অদ্বৈত মতের সমালোচনা, আর্য ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘাত, ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মসাধন, বিদ্যা এবং জ্ঞান, দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিব ইত্যাদি। সেকালের 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ দ্বিজেন্দ্রনাথ লেখেন যথা 'পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্র'— সেগুলি অপ্রকাশিত থেকে গেছে।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে দ্বিজেন্দ্রনাথ-রচিত কাব্যগ্রন্থ 'স্বপ্নপ্রয়াণ' প্রকাশিত হয়। ছন্দ, ভাষা, কল্পনা ও উপমা— এইগুলির উৎকর্ষে কাব্যগ্রন্থটি অনুপম। দ্বিজেন্দ্রনাথের ছন্দ-কুশলতা ও ছবি-রচনার নৈপুণ্যের দু-চারটি উদাহরণ দিই—

ঘন বনচ্ছায়
কজ্জলের প্রায়,
তীরে যথা নীরে তথা, ভেদ নাহি অণু।

...

নিকুঞ্জে ডাকিছে পিক,
নিভৃত চারি দিক
নয়ন অনিমিক,
ফিরান' দায়।

...

কিজানি কিসের লাগি হইয়া উদাস
ঘরের বাহির হ'ল মলয়-বাতাস॥
ফুলের ঘোমটা খুলি কাড়য়ে সুবাস।
"এ নহে সে" বলি' শেষে ছাড়য়ে নিশ্বাস।

...

হেত্তায় ঝর ঝর, ঝর ঝর, ঝরণা ঝরে।
পাদপ, মর মর, মর মর, শবদ করে॥

...

গিরি যথা উচ্চ
ধরা করে তুচ্ছ,
সরিৎ ত্বরিত বহে তট চুমি চুমি।

...

পড়ে যেই লোক এই শ্লোক, পায় সে গুম্ফলোক
ইহার পরে।
যথা গুম্ফধারী, ভারি ভারি, গোঁপের সেবা করি
সুখে বিচরে।

...

রাজবালা অনিন্দিতা
কুসুম সুললিতা—
কিরণ নিরমিতা
দেবীর প্রায়—
লাবণ্যে পালঙ্ক ধুয়ে
ভাবিছে শুয়ে শুয়ে
সখীরা মোরে থুয়ে
গেল কোথায়?

শুধু ছন্দোনৈপুণ্য, উপমার অনুপমত্ব ও শব্দ-চয়নের মুন্সিয়ানা নয়, বাংলা গদ্যে ও পদ্যে চল্‌তি ভাষার ব্যবহার করার পথিকৃৎ হচ্ছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ বহুকাল সাধু ভাষার আঙিনায় তাঁর কবিতা ও গদ্য-রচনাকে বন্দী করে রেখেছিলেন, আর প্রমথ চৌধুরী দ্বিজেন্দ্রনাথের বহু পরে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'সবুজ পত্র'-এর বিদ্রোহ ঘোষণা করেন চল্‌তি ভাষার হয়ে। দ্বিজেন্দ্রনাথের কবিতা ও প্রবন্ধ থেকে চল্‌তি ভাষার ব্যবহারের কয়েকটি উদাহরণ তুলে দিচ্ছি—

তুব্‌ড়িয়া যায় ছাতা বৃষ্টির থাবোড়ে
ভুঁয়ে লপটায় কোঁচা হয়ে লড়্‌বোড়ে।

...

মিনিট পনেরো ষোলো বৃষ্টি হল ঝেড়ে,
নরমিয়া ক্রমশ বাদল গেল ছেড়ে।

...

সেলামিয়া বারে বারে, আইল সে গৃহ-দ্বারে
সাধু ভাবে একি পাপ-দৃশ্য।

...

তোমার ছোটো বঁহিন্ লালসা যে,
আনিতে তাহারে হয় সাজাইয়া বসন্তের সাজে।

...

চোখাইয়া চাহনি— বিষম ভুরু-ধনুকের বাণ!
কাহার বধিতে প্রাণ ঘোরতর পাতিছে কামান।

...

কিন্তু কোথা হেন মন, কিছু যাতে নাহি ফেরফার?
কোথায় সে মন যার আছে বোধ হৃদয় সবার।

...

শ্রীকৃষ্ণ যৌবনে পদার্পণ করিতে না করিতেই কালীয় নাগকে দমন করিয়া আপন বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন এবং কংসের **টুয়াইয়া-দেওয়া** পুতনা নামক রাক্ষসীর এবং বক নামক অসুরের দলবল কলে-কৌশলে নিহত করিয়া আপনার অসামান্য বুদ্ধিচাতুর্যের পরিচয় দিয়াছিলেন।...

আমি হাঁপানি রোগের একটা **মাতব্বর** ওষুধ জানি কিন্তু কাহারও নিকট আমি আমার বিদ্যা **ফাঁস** করিব না।

—'আর্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের সংঘাত'

সুর বাঁধিবার সময় সেতারের কান **ক'ফের** মুচড়াইতে হইবে—বাদকের কানই তাহা বলিয়া দিতে পারে, **তা বই** সঙ্গীতের ব্যাকরণ তাহা বলিয়া দিতে পারে না। —'বিদ্যা এবং জ্ঞান'

কতক বা আমি দেখিয়া শিখিয়াছি, কতক বা ঠেকিয়া শিখিয়াছি, কতক বা হাতে কলমে **করিয়া-কম্মিয়া** শিখিয়াছি।

—'সভাপতির ভাষণ', সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে

ইংলণ্ডে নব্য সাহিত্যের **উঠন্তি** সময়ে —'সভাপতির ভাষণ'

ধর্মের সীধা পথ আর নীতির পেঁচাও পথ —'সভাপতির ভাষণ'

ধামা ধরা'র সঙ্গে **কণাধরা'র** মিল খায় কই?

—'সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা'

লাভের মধ্যে কেবল **ফুঁয়ে ফুঁয়ে টক্‌রাটক্‌রি** লাগাইয়া দিয়া··· বঙ্গসমাজে গৃহবিচ্ছেদের Cyclone ডাকিয়া আনা হয়।

—'সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা'

গিল্টি-করা সোনার গয়নার ন্যায় **অধম-তোষা, অর্থ-শোষা** শাঁস-বর্জিত খোসা। —'বাবুর গঙ্গাযাত্রা'

কুলানুরাগীর প্রধান গালাগালি হচ্ছে **বাপান্ত**— দেশানুরাগীর প্রধান গালাগালি হচ্ছে দেশান্ত যেমন ড্যাম্ নিগর প্রভৃতি সাদর সম্ভাষণ।

—'সাধনা— প্রাচ্য ও প্রতীচ্য'

পুরুষের জ্ঞানের ভালোবাসা একপ্রকার রত্নচেনা **চোকোলো** ভালবাসা। —'হারামণির অন্বেষণ'

সমুদ্রের তরঙ্গ মাথা **উঁচু** করিয়া তটভূমিতে **ঢু** হানে।

—'হারামণির অন্বেষণ'

শাখা-হেলানিয়া তাল গাছটা দেখিতেছি।

—'সারসত্যের আলোচনা'

গৌরাঙ্গ দেবতারা বজ্রধ্বনিতে দশদিক **ফরসা** করিয়া লোকের চক্ষে ভরসা আনয়ন করিলেন। —'সাধনা—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য'

উদাহরণ দেওয়ার লোভকে ঠেকাতে না পারলে মুশকিলে পড়তে হবে, কেননা দ্বিজেন্দ্রনাথের কবিতা ও গদ্য রচনা থেকে এইরকম শত শত উদাহরণ উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

চিঠি-লেখার কলা-নৈপুণ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথের সমকক্ষ বাংলা সাহিত্যে আর কেউ ছিলেন বা আছেন বলে জানা নেই। চিঠি-লেখা যে একটি বিশেষ সাহিত্য-কলা, তার রূপের ও বাঁধুনির যে একটি স্বকীয়তা থাকতে পারে বা আছে সেটি সম্বন্ধে আমরা সচেতন নই। চিঠি যেন প্রবন্ধের এলাকা-ভুক্ত, তার ভাষা ও রূপ প্রবন্ধের অনুগত— এই হচ্ছে সচরাচর ধারণা। ভাষায় ও রূপে চিঠি কিন্তু প্রবন্ধানুগামী নয়, অন্তত প্রবন্ধের অনুকরণ করতে চিঠি বাধ্য নয়। একটি ভাবধারাকে নিয়ে তাকে গুরুগম্ভীর ভাবে বিশ্লেষণ করা প্রবন্ধের ধর্ম, চিঠির নয়। প্রবন্ধ ব্যক্তি-বিশেষত্ব-বর্জিত, কোনো ব্যক্তির ধার সে ধারে না,

নৈর্ব্যক্তিক ভাবের প্রকাশ তাতে। আর চিঠি হচ্ছে— যে লিখছে আর যাকে লেখা হচ্ছে— এই দুজনের মধ্যে যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে তার ব্যক্তিগত সম্বন্ধের রসে ভরপুর। এই বিশেষ ভাব-সম্বন্ধের পরিচয় না থাকলে চিঠি সার্থক হয় না, চিঠি প্রবন্ধ হয়ে যায়। দ্বিজেন্দ্রনাথের চিঠিগুলি চিঠির এই স্বকীয়তার রসে নিটোল। যাঁকে তিনি লিখছেন তাঁর ব্যক্তিত্বকেও যেন আস্বাদন করতে পারছি চিঠি থেকে।

রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের গভীর বন্ধুত্ব ছিল, যদিও রাজনারায়ণ দ্বিজেন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক বড়ো ছিলেন বয়েসে। কত যে পত্র-বিনিময় হয়েছে এঁদের দুজনের মধ্যে তার ইয়ত্তা নেই। সেই-সব অমূল্য চিঠি প্রকাশিত হলে বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হত। আমাদের দেশে এই ধরণের সব সৃষ্টি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে আটক করে রাখার যে রেওয়াজ আছে তার ফলে দেশবাসী বঞ্চিত হন রসাস্বাদনে।

রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে লেখা একটি চিঠি উদ্‌ধৃত করছি—

শ্রদ্ধাস্পদ রাজর্ষি

আমি এক্ষণে চিকিৎসায় ব্রতী হইয়া সমাজের ক্ষতস্থানে এষণী চালনা করিতেছি। এষণী কাহাকে বলে সুশ্রুত পড়িয়া দেখুন। আমার চিকিৎসা-শাস্ত্র অচিরেই আপনাকে প্রণাম করিতে যাইবে। এখনো তাহা দপ্তরীর কঠোর হস্তের Shampooing হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই অথবা নিষ্কৃতি পাইয়া থাকিবে আমি তাহা জানি না। এবারে আপনার সমালোচনাটা কিরূপ মূর্তি ধারণ করে—অগ্নিমূর্তি অথবা শিশির মূর্তি অথবা ৪৯ মূর্তি—তাহা দেখিবার জন্য আমি দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া রহিয়াছি।

যোগীন আমার laboratoryতে যখন অষুধ প্রস্তুত হইতেছিলো তখন আমার কাছে ছিল— কতক কতক সন্ধান জানিয়াছে। তাই I am afraid, যোগীন পাছে নিজে চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হয়; তাহা হইলে আমার রুটি মারা যাইবে।

আমার রেখাক্ষর ছাপা হইয়াছে, আমি তাহা স্বহস্তে ছাপিয়াছি— Printer, Publisher. দশ কপি ছাপাইয়াছি— public এর জন্য নহে কিন্তু apostle দিগের জন্য—I want 10 apostles—not 12; since decimal system in the present Century superceded all other numerical systems in the field of exact Science.

Each one of apostles will be required to furnish himself

with 10 disciples, each of which 10 disciples will be again similarly propelled by stringest vows to seek out 10 disciples for himself and so on to infinity.

রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে লেখা আর-একটি চিঠিতে রাজনারায়ণ দর্শনে দেওঘরে যাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও যেতে পারছেন না— এইটে জানিয়ে লেখেন —'দীন দ্বিজের রাজদর্শন না ঘটিবার কারণ'-•

টঙ্কা দেবী কর যদি কৃপা
না রহে কোন জ্বালা।
বিদ্যাবুদ্ধী কিছুই কিছু না,
খালি ভস্মে ঘি ঢালা॥
ইচ্ছা সম্যক্ তব দরশনে
কিন্তু পাথেয় নাস্তি।
পায়ে শিক্লী মন উড়ু উড়ু
এ কি দৈবের শাস্তি।

রাজনারায়ণ বসুকে লেখা আর-একটি চিঠিতে লিখছেন—

…আপনি দেওঘরে কত দিন এরূপ পেরেক বদ্ধ (crucified as it were) হইয়া থাকিবেন ? no সাড়া no শব্দ, যেন forgotten অব্দ,— this is rhyme ! ‥

আপনি দুইটি বিষয়ে বেজায় চুপ করিয়া গিয়াছেন—কার্য-কারণ তত্ত্ব এবং কৃষ্ণকমলী-সংগ্রাম। লেখনীর ছিটাগুলি বর্ষণ করুন— আমি ধৈর্যের ঢাল ধরিয়া বসিয়া আছি। আমি আপনারই তো champion, আমাকে যত উৎসাহিত করিবেন ততই কোমর বাঁধিয়া লাগিব।…কৃষ্ণকমল is not যে সে লোক— he is a terrible fellow. He knows how to write and how to fight and how to slight all things divine.

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—এই দুজনকে একসঙ্গে লিখিত একটি চিঠি উদ্ধৃত করার লোভ সামলানো সম্ভব হল না। দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখছেন—

দিনু, নগেন,

রাঁচির একজন লোক— জ্যোতির নিকটে সে সর্বদা যাওয়া আসা করে—সে টাকার অভাবে বই ছাপাইতে পারিতেছে না এই রূপ এক পত্র

আমাকে লিখিয়া সাহায্য প্রার্থনা করাতে আমি তাহার সেই পত্রখানি জ্যোতির নিকট চালান দিয়া জ্যোতিকে লিখিয়াছিলাম যে রাঁচির লোক তোমার jurisdictionএর অন্তর্ভুক্ত, আমার jurisdictionএর অধিকার বহির্ভূত, অতএব তুমি ইহার যাহা ভাল বোঝো তাহা কর। জ্যোতি ইহার উত্তরে আমাকে লিখিলেন যে, অর্থই অনর্থের মূল—রাঁচির শান্তিধাম শান্তিনিকেতনের মতো অর্থরাজ্যের অধিকার বহির্ভূত।

এই পত্রের উত্তরে জ্যোতিকে আজ আমি এই রূপ একখানি পত্র লিখিলাম— যথা :

বলিছ কি জ্যোতিরাজ,
বলিতে করে না লাজ ? !!!
লইয়া প্রণত শিরে যাহার কল্যাণ
রাঁচি-শিরে উড়াইলে কীরতি-নিশান,
অনর্থ বলিছ তারে ? !!! বসিয়া যে-ডালে—
কাটিছ তাহার মূল শাণিত কুড়ালে ? !!!
বসেছ রাঁচির শিরে অট্টালিকা ফাঁদি,
আসে যে অর্থের আশে, যাবে সে কি কাঁদি ?
পূর্ণচন্দ্র পেলে হাতে, খাইয়া যে বাঁচে,
অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া তারে ভাগাতে কি আছে ?
ইজিবিজি কাটিয়াছ কলমের তেজে !
অর্থ এর কোন্ ঠাঁই ? শব্দ শুধু এ যে !!
"অর্থই অনর্থ আর অনর্থই অর্থ"
ইহার অর্থ বোঝে কাহার সামর্থ্য ?
অর্থই অনর্থ যদি, গ্রীষ্ম তবে শীত !
জ্যোতি তবে আঁধার, অহিত তবে হিত !
রাঞ্চি বাসী বলে হাসি "বাহোবা-বাহোবা" !
কেহ বা বুলায় দাড়ি বলি "তোবা তোবা" !
অনর্থই যদি সার— অর্থ যদি ছাই—
জ্যোতি তবে বড়দাদা, দ্বিজ ছোটো ভাই।

যুক্তাক্ষর বর্জন সম্বন্ধে একটি সরেস কবিতা তিনি নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখে পাঠিয়েছিলেন একটি চিঠিতে। চিঠিটি হচ্ছে এই—

নগেন,

বহুত আচ্ছা— নিম্নলিখিত কয়েক ছত্র কবিতা (?) সংকলিত পত্রিকার এক কোণে প্রকাশের জন্য দিলাম।

বাংলাভাষার বর্ণমালীর প্রতি বাণীদেবীর উপদেশ।

বর্ণমালি! বাণী-মা কী বলিছেন— শোনো!
"তেলা শিরে তেল দিয়া ফল নাই কোনো॥
"আর ত দিলে আর্ত্ত এ ছাড়িবে আর্ত্তরব।
"আর দ চাপাইলে পিঠে মরিবে গর্দ্দভ॥
"ইষ্ট করিও না নষ্ট— বোঝা করি পুষ্ট।
" 'অৰ্দ্ধে' দিয়া অর্দ্ধচন্দ্র অর্ধে থাক তুষ্ট।
কর্মের ম'এ মফলা অকর্ম্মের শেষ।
"কার্য্যের য'এ যফলা অকার্য্য-বিশেষ।
"অর্চ্চনার ঘটা এ যে বড্ড জমকালো।
"শুদ্ধমতি ভকতের অর্চনাই ভালো॥
"অর্জ্জনের দেহ ফুলি হইয়াছে ঢাক।
"কাজ নাই তাহাতে— অর্জন বেঁচে থাক॥
"গর্ব্ব গর্ত্ত অতিশয়'গর্ব্ব গর্ত্ত' এটা।
"গর্ব গর্ত লিখিলেই চুকি যায় লেটা॥
"কর্কশ-নিনাদে একে কাণ ঝালাফালা।
"দ্বিগুণ কর্ক্শ করি বাড়ায়ো না জ্বালা।
"বর্ণমালি! আঁখি পোঁছো! মা করুণাময়ী!
"মার আজ্ঞা শিরে ধরি হও দিগবিজয়ী!!
"বর্ণমালা দুই ছড়া গাঁথি যতনে,
"নিবেদ মায়ের পায়ে— কী ফল রোদনে।"

• প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'সনেট পঞ্চাশৎ' কাব্যগ্রন্থটি দ্বিজেন্দ্রনাথকে পাঠান। সনেটগুলি পড়ার পর দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে এই রসালো চিঠিটি লেখেন—

প্রিয় প্রমথ,

তোমার সনেট পাঠে আমি খুব আনন্দ লাভ কল্লুম। বেশ মিঠে কড়া ছাঁদে তুমি তোমার মনের কথাগুলি বিনিয়ে বিনিয়ে বলে মনের ক্ষোভ মিটিয়েচ; অতি চতুর রকমে। তোমার ভাষার একটি বিশেষ চমৎকারিতা এই যে, তোমার ছত্রগুলির মর্ম্মরস পড়বা মাত্রেই হৃদয়ে পৌঁছে। আমাদের দেশের সাহিত্যওয়ালারা কবিআনা ঢঙকেই মনে করেন কবিত্বরসের পরাকাষ্ঠা। আমার কিন্তু তাহা দু চক্ষের বিষ; তোমার পুস্তকখানির মধ্যে কবিআনা ঢঙ একটুও নাই, অথচ রস আছে বেস্ একরকম অম্লমধুর গোচের অতি মনোহর; তাই তাহা বড্ড আমার ভাল লাগিল। কয়েকটি বিষয়ে তোমার নিকটে আমার জিজ্ঞাস্য আছে— ভাষ আবার কি? ভর্ত্তৃহরির বিশেষ বিবরণ কিছুই আমি জানি না— কিন্তু তিনি "নাস্তিকের শিরোমণি আস্তিকের রাজা" এ কথাটা আমার নিকটে নিতান্তই প্রহেলিকা মনে হইতেছে। কাটমল্লিকা ফুল কাহাকে বলে? তাহার আকার প্রকার কি রূপ?

"হৃদয়ের ভুল শুধু জীবনের সার" এ কথাটা উপরের তিন ছত্রের সঙ্গে ঠিক মাফিক লাগচে না, তাই উহার অর্থ আমি বুঝতে পারচি নে।

"মত ত্রিশঙ্কুর" এটা একটু যেন cart before the horse হয়েচে— কিন্তু rhyme হয়েচে ভালো। আত্মকথাতে তুমি লাটাইএর মান বাড়াইয়া দিয়াছ বেজায় বেশী। লাটাই তোমার প্রশংসা বাক্যে গর্বে স্ফীত হইয়া যদি ঘুড়িকে আকাশ হইতে টানিয়া আনিয়া মাটিতে ফেলিয়া তাহার উপরে দুই চারিবার লাপ্‌টালাপ্‌টি করে— তবে ঘুড়ির দশা কি হইবে?

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী জ্যাঠামহাশয়

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে এই ছোট্ট চিঠিটি লেখেন শান্তিনিকেতন থেকে—

ভাই সতু,

তোমার চিঠি পাইয়া বাঁচিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম— আমি যেমন কলিকাতার রোগশয্যা হইতে 'হিজলি সে আয়া' অবস্থায় শান্তিনিকেতনে আসিয়াছিলাম— তুমি হয়তো সেইরূপ অবস্থায় রাঁচিতে উপনীত হইয়াছ। আমি political horizon হইতে একমুষ্টি ঘনমেঘাঞ্জন চাঁচিয়া লইয়া অত্র সম্বলিত পাঠাইতেছি— ইহাতে হয়তো তোমার চক্ষু ফুটিবে।

আমি সপ্তাহ পূর্বে গান্ধীকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছি এই সঙ্গে তাহারো নকল পাঠাইতেছি।

তোমার বড়দাদা

যে-সব চিঠি উদ্ধৃত করেছি সেগুলি থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথের চিঠি লেখার মৌলিকত্ব রসিকদের কাছে সহজেই ধরা পড়বে। গদ্যে ও পদ্যে লেখা এই ধরনের অসংখ্য চিঠি দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখেছেন তাঁর ভাইদের ও বন্ধুবান্ধবদের।

বাংলা ভাষায় পরিভাষা রচনার কাজে দ্বিজেন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম হাত দিয়েছিলেন। বহু পরিভাষা তিনি সৃষ্টি করে গেছেন, তার মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করি—

Conventional—মুখস্থ রকমের
Infusion—অনুপান
Law of heredity—সন্ততির নিয়ম
Law of adaptation—সংগতির নিয়ম
Parallel-running—সহানুপাতী
Non-conductor—রোধক
Conductor—সঞ্চারক
Mechanics—যন্ত্র-বিদ্যা
Mother tincture—মাতৃকসত্ব
Autocracy—স্বেচ্ছাচারতন্ত্র
Oligarchy—কিয়জ্জনতন্ত্র

সংগীতের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। বহু গান তিনি রচনা করেছিলেন যেগুলি ব্রহ্মসংগীত হিসাবে আজও সমাদৃত। ব্রহ্মসংগীত ছাড়াও তিনি প্রেম-বিষয়ক গানও লিখেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ-রচিত সাধারণের অজানা দুটি গান উদ্ধৃত করছি—

ও সে চাহিলো যখন মুখ ফিরে
কাড়িল পরাণ বুক চিরে।
কি মন্ত্র জানে, বধিল পরাণে,
বিঁধিল পরাণ এক তীরে।

—

বসন্তের কাল গেছে কেন ফুল ফুটিবে আর
ভানু গেছে অস্তাচলে হবে নাকি অন্ধকার।

ছিঁড়িয়া গিয়াছে তার, বীণা কি বাজিবে আর,
হাসিটুকু নিয়ে গেছে রেখে গেছে হাহাকার।
ছিলো প্রাণ সে গিয়াছে দেহে কি আর কেগো আছে,
কাহারে কেমন আছ শুধাইছো বারে বার।

দ্বিজেন্দ্রনাথ যে শুধু গান-রচয়িতা ছিলেন তা নয়, স্বরলিপির স্রষ্টা তিনি। তিনিই সর্বপ্রথম ভারতীয় সংগীতে স্বরলিপির প্রবর্তন করেন। এই ঐতিহাসিক তথ্যটুকু পরবর্তীকালের তথ্য-বিরুদ্ধ প্রচারের প্রবল তোড়ে ভেসে গেছে। অতীতের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' দ্বিজেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপির সাক্ষ্য বহন করছে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন মনে প্রাণে স্বদেশী। ভারতবর্ষের সর্বতোমুখী সাধনার সঙ্গে তাঁর পরিচিতি ছিল যেমন গভীর, তেমনি ছিল তাঁর শ্রদ্ধা ভারতের যুগযুগান্তব্যাপী সাধনার প্রতি। কিন্তু তাঁর শ্রদ্ধা যুক্তিকে বর্জন করে নিছক ভাবালুতা-আশ্রয়ী ছিল না। কুসংস্কার ও অন্ধতাকে রূপক দ্বারা ব্যাখ্যা করবার চতুরতাকে দ্বিজেন্দ্রনাথ অশ্রদ্ধেয় প্রয়াস বলে মনে করতেন।

একটি প্রবন্ধে তিনি লিখলেন—

> স্থিতিশীল সমাজ যাঁহাদের প্রস্তরের দুর্গ তাঁহারা তাঁহাদের স্বার্থের অনুরোধে বলিতে পারেন "সমাজ দিব্য চলিতেছে," এমন কি নিম্নশ্রেণীর লোকেরাও অন্ধসংস্কারের বশবর্তী হইয়া আপনাদের স্বার্থের বিরুদ্ধেও উপরি-উক্ত কথায় মাথা নোওয়াইতে পারে— কিন্তু অপক্ষপাতী জ্ঞান কখনো ঐ রূপ কথায় সায় দিতে পারে না। জ্ঞান স্পষ্টই বলিবে যে "এ সমাজের নাড়ী পাওয়া যাইতেছে না, ইহাতে গতির তাড়িত সঞ্চার করিতে আর এক দণ্ডও বিলম্ব করা উচিত নয়।"—'নব্য বঙ্গের উৎপত্তি স্থিতি এবং গতি'। তিনি বললেন—"ঐকান্তিক স্থিতির গুরুভার যখন সমাজের অসহ্য হইয়া উঠে, তখন সমাজ পরিবর্তনের দিকে স্বভাবতই উন্মুখ হইয়া থাকে।" —'নব্যবঙ্গের উৎপত্তি স্থিতি এবং গতি'

কিন্তু তিনি চিন্তার ভারসাম্য হারান নি কখনো। যথার্থ যুক্তিবাদী দ্বিজেন্দ্রনাথ স্থিতিশীল অনড় মনোভাবের বিষময়তার দিকে যেমন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তেমনি সাবধান করে দিলেন আমাদের স্থিতিহীনতার ভয়াবহতা সম্বন্ধে। তিনি লিখলেন—

> কিন্তু আর এক দিকে দেখা যায় যে, গতিরোধক স্থিতি সমাজের পক্ষে যতই কেন ভয়াবহ হউক্ না, স্থিতি-ভঞ্জক গতি তাহা অপেক্ষা

আরো অধিক ভয়াবহ।…ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঋতু পরিবর্তন হইলে বৎসরের ফল যেমন ভয়ানক হয়, ক্রমাগত নূতন নূতন নূতনের স্রোত বহিতে থাকিলে সমাজেরও সেই রূপ দুর্দশা হয়।

—'নব্য বঙ্গের উৎপত্তি স্থিতি এবং গতি'

দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখলেন—*

কার্যে অনুকরণ-প্রিয়তা এবং বাক্যে অনুবাদ-প্রিয়তা, এ দুটি থাকিতে, আমরা স্বাধীনতাই বলি আর উন্নতিশীলতাই বলি, যাহা বলি তাহার বিপরীত অর্থ গ্রহণ করিলে ঠিক হয়।…উন্নতিশীলতার আভিধানিক অর্থ যাহা হউক না কেন, বর্তমান সময়ে তাহার অর্থ ঔদ্ধত্য এবং জ্যাঠামি।… বঙ্গীয় যুবকেরা উন্নতিও বোঝেন না, শ্রেয়ও বোঝেন না, আড়ম্বরই বুঝেন। উন্নতিসাধনের অর্থ আড়ম্বরসাধন। ভাষার উন্নতিসাধন কি? না শব্দাড়ম্বর। মনুষ্যের উন্নতি সাধন কি? না বাহ্যাড়ম্বর।… আক্ষেপের বিষয় এই যে আধুনিক বঙ্গীয় যুবকেরা ব্যক্তি-মাহাত্ম্য যেমন বোঝেন ভাব-মাহাত্ম্য তেমন বোঝেন না।

সমকালীন যুবক-সমাজের আধির গোড়া-ঘেঁষা বিশ্লেষণ দ্বিজেন্দ্রনাথ বহু যুগ আগে করে গেছেন।

তিনি যুবকদের আত্মস্থ হওয়ার জন্যে আবেদন জানিয়ে বলেছেন—

যাহার অন্তরে যাহা নাই তাহা তাহাকে অনুকরণের ঝিনুকে করিয়া কোনো মতেই গিলাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না।… যাহার অন্তরে যাহা প্রসুপ্ত আছে তাহাই উদ্বোধিত হয়, যাহা মুকুলিত আছে তাহাই বিকশিত হয়, যাহা প্রচ্ছন্ন আছে তাহাই অঙ্কুরিত হয়। ভস্মে আহুতি দিলে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে না— অগ্নিতে আহুতি দিলেই অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। —'আর্যামি এবং সাহেবিআনা'

বিচারহীন স্থিতিশীলতা ও উদ্দেশ্যহীন উন্মত্ত গতিশীলতা— এই দুয়েরই বিরোধী ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। খাঁটি আধুনিকত্বের অর্থ হচ্ছে প্রচলিত সংস্কারগুলিকে বিচারের দ্বারা যাচিয়ে নেওয়া, যা বর্জনযোগ্য তা বর্জন করা, যা সংরক্ষণযোগ্য তাকে স্বীকার করে স্থায়িত্ব দেওয়া, কালের ইঙ্গিতকে জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি করা, স্থাণুতাকে দূর করে ব্যক্তির জীবনকে ও সমাজকে গতি দেওয়ার চেষ্টা করা এবং গতির পাগলামিকে আদর্শের লাগাম দিয়ে বশীভূত করে সংযত করা। দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন এই ধরনের খাঁটি আধুনিক।

পথ, সেই পথ ধরে ব্যক্তির জীবন, সমাজের জীবন ও দেশের জীবন এগিয়ে যাবে পরিণতির দিকে এই ছিল তাঁর ধারণা।

রাজনারায়ণ বসুকে লেখা একটি চিঠিতে দ্বিজেন্দ্রনাথ লেখেন—

যদি আমরা আমাদের আপনাদের দেশের manners, customs রক্ষা করা শ্রেয়ঃ বোধ করি; তবে **Reasonএর দোহাই দিয়াই সেই পথ অবলম্বন করিব— antiquityর দোহাই দিয়া নহে।** কেন না antiquityর দোহাই দিয়া কত যে ছাইভস্ম পার হইয়া যাইতেছে, তাহার ঠিকানা নাই।··· ধর্মভাব উজ্জীবিত করা শ্রেয়ঃ··· **কিন্তু not because it prevailed ages ago, but because it is in harmony with the development of Human Reason which characterizes the present age.**

ক্ষণিক থেকে শাশ্বতকে সরিয়ে দেখার স্বচ্ছ দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। বিশ্লেষণ-পটু যুক্তি-আশ্রয়ী ছিল তাঁর মন। যুক্তিহীন বর্জন কিম্বা যুক্তিহীন গ্রহণ— কোনোটাই তাঁর মনকে ও বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে নি।

রামমোহনের মৃত্যুর পর স্বাদেশিকতার ধারাটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬)। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উদারনৈতিক দলের সদস্য প্রসিদ্ধ বাগ্মী জর্জ টম্‌সনকে আমন্ত্রণ করে ভারতবর্ষে নিয়ে এসেছিলেন দ্বারকানাথ। বাঙলাদেশের তৎকালীন যুবকদের রাজনৈতিক চেতনা-সঞ্চারে জর্জ টম্‌সন যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন। দ্বারকানাথ ছিলেন মনেপ্রাণে স্বদেশী। তাঁর পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) শুধু উপনিষদ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞানের প্রচারেই নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন নি, সাহিত্য-সাধনা, সমাজসংস্কার ও রাজনৈতিক কাজ— এই ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কাজের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে 'দেশহিতার্থী সভা' নামক একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন তার সম্পাদক। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে 'ভারতবর্ষীয় সভা' যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, দেবেন্দ্রনাথ হন তার সম্পাদক। স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানানো হয় ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে মেমোরাণ্ডাম পাঠিয়ে। 'ভারতবর্ষীয় সভা'র সম্পাদক হিসেবে দেবেন্দ্রনাথ তাতে স্বাক্ষর করেন।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রেরণায় ও অর্থসাহায্যে 'হিন্দু মেলা' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল তারিখে চৈত্র-সংক্রান্তির দিনে

চিৎপুরে রাজা নরসিংহ চন্দ্র রায়ের উদ্যানবাটীতে 'হিন্দু মেলা'-র প্রথম উদ্‌বোধন হয়। 'হিন্দু মেলা'-র প্রথম সম্পাদক হন গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর সহকারী সম্পাদক হন মহর্ষির শিষ্য নবগোপাল মিত্র। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর তিন বছর সম্পাদক ছিলেন। ৮৭০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ— এই চার বছর দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন 'হিন্দু মেলা'র সম্পাদক। 'হিন্দু মেলা' প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখেছেন—"নবগোপাল একটা ন্যাশনাল ধুয়া তুলিল। আমি আগাগোড়া তার মধ্যে ছিলাম। সে খুব কাজ করিতে পারিত··· কিন্তু কি রকম কি হওয়া উচিত, সে সব পরামর্শ আমার কাছ থেকে লইত। একটা মেলা বসাইবার কথা বলিল— তাঁতি, কামার, কুমোর ইত্যাদি লইয়া।"

এই 'হিন্দু মেলা'-র জন্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত গান 'মলিন মুখ-চন্দ্রমা ভারত তোমারি' রচনা করেন। নট-বেহাগ সুরে-বাঁধা এই গানটি স্মরণযোগ্য—

মলিন মুখ-চন্দ্রমা ভারত তোমারি।
দিবা রাত্রি ঝরিছে লোচন-বারি ॥
চন্দ্র জিনি কান্তি নিরখিয়ে, ভাসিতাম আনন্দে,
আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি।
এ দুঃখ তোমার হায় রে সহিতে না পারি ॥

'হিন্দু মেলা'-র পরিচালনার জন্যে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে 'জাতীয় সভা' (ন্যাশনাল সোসাইটি) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম থেকেই দ্বিজেন্দ্রনাথ এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ-সভার সদস্য ছিলেন। ১৮৭৪ সালে তিনি 'জাতীয় সভা'-র সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন।

গান্ধীজি-প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন পূর্ণ সমর্থক। তিনি বার বার বলতেন— এতদিন বাদে একজন মানুষ এসেছেন যিনি ভারতবর্ষের প্রাণের মানুষ। তিনি ভারতবর্ষকে উদ্ধার করবেন। বলতেন— আর আমার ভয় নেই, দুশ্চিন্তা নেই। ভারতবর্ষ বাঁচবে।

১৯২২ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর গান্ধীজির সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখলেন—

The Four Pillars Of Satyagraha

The passion for liberation মুক্তি which is the essence of Hinduism is the keynote of Mahatma Gandhi's philosophy and the four pillars are

হইতে। Darwinist বলিবেন Evolution হইতে। কিন্তু evolution তোমার আমার নিকটে খুব একটা বড় জিনিস হইতে পারে—কিন্তু অসীম জগতের নিকটে এমন কি পৃথিবীর নিকটেও উহা এক মুহূর্ত কালের বুদ্‌বুদ্ মাত্র। The question is কুরুক্ষেত্রতুল্য warএর ঔষধ কি? ঈশ্বরের নিকট জয়প্রার্থনা করা ঔষধ হওয়া দূরে থাক তাহা কুপথ্যের একশেষ। উভয় belligerent party মিলিয়া যদি ঈশ্বরের নিকটে "অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতংগময় আবিরাবির্ম এ ধি। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং" প্রার্থনা করে তাহা হইলে নিমেষের মধ্যে war থামিয়া যায়। This is the only medicine.

১৩৩২ সালের ৪ঠা মাঘ তারিখে ছিয়াশী বৎসর বয়সে দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। শান্তিনিকেতনের প্রান্তে একটি নিরালা ভবনে ভারতীয় ও বিশ্ব -সাধনার যে দীপটি জ্বলছিল তা নিবে গেল। তাঁর মৃত্যুর পর শান্তি-নিকেতনের স্মরণ-সভায় রবীন্দ্রনাথ বলেন—"তুমি কি শুধু আমাদের বড়দাদা ছিলে, তুমি সকলের বড়দাদা।"

দ্বিজেন্দ্রনাথের শেষ জীবনে দীর্ঘকাল তাঁর সান্নিধ্যলাভ করবার দুর্লভ সৌভাগ্য যে কয়জন লাভ করেছিলেন বন্ধুবর সুধাকান্ত রায়চৌধুরী তাঁদের অন্যতম। শুধু জ্ঞানের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রনাথ অনন্যসাধারণ পুরুষ ছিলেন তা নয়, মানুষ হিসেবেও তিনি ছিলেন অনন্য। তিনি সত্যই ছিলেন এক নতুন ধরনের, এক নতুন জাতের মানুষ। এই নতুন জাতের মানুষটির পরিচয় দিয়েছেন সুধাকান্ত রায়চৌধুরী তাঁর বইটিতে। নতুনের স্বপ্নে বিভোর বাঙলা দেশ নকল নতুনের ফাঁদে না পড়ে আসল নতুনকে চিনতে শিখুক। এই বইটি সেই সত্য দৃষ্টি লাভের সাধনায় আমাদের সাহায্য করবে বলে আমার বিশ্বাস।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্মৃ তি ক থা

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে আমার স্মৃতিকথা লেখবার পূর্বে ভূমিকা-স্বরূপ তাঁর পরিচয় সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু লেখা প্রয়োজন মনে করি।

কলকাতা জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর-পরিবারে দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দের ১১ মার্চ। স্বনামধন্য প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ।

দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতিভা ছিল বহুমুখী। দর্শনশাস্ত্রে, সংগীতশাস্ত্রে, চিত্রাঙ্কণবিদ্যায়, জ্যামিতিতে, অঙ্কশাস্ত্রে ও সাহিত্যে তাঁর জ্ঞান ছিল অসাধারণ। কিন্তু তিনি শিক্ষিতসমাজে বিশেষভাবে তত্ত্বজ্ঞানী এবং দার্শনিক হিসাবেই সুপরিচিত। তিনি বহু গ্রন্থই লিখেছেন, সেই-সব গ্রন্থের একটি তালিকা প্রস্তুত করলে তার সংখ্যা কমপক্ষে হবে পঁচিশ-ছাব্বিশটি। তাঁর শেষ গ্রন্থ 'গীতাপাঠ'। বাংলা শর্টহ্যাণ্ডে কি রকম করে বাংলা লেখা যায় তারও উপায় তিনি দেখিয়েছেন তাঁর 'রেখাক্ষর বর্ণমালা' গ্রন্থে। শুধুই কি শর্টহ্যাণ্ড! সংগীতের বাংলা স্বরলিপির গোড়াপত্তন তিনিই করেছিলেন যদিও তা গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয় নি। এ কথা তাঁর কাছেই শুনেছি। তাঁর লেখা স্বরলিপির কোনো পাণ্ডুলিপি কোথাও আছে কিনা তার সন্ধান আমার জানা নেই। একদিন তাঁর কাছে এ বিষয় জিজ্ঞেস করেছিলাম। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'অনেক কিছুই লিখেছিলাম লেখার ঝোঁকে। সে-সব লেখার পাণ্ডুলিপি যত্ন করে রাখবার উৎসাহ ছিল না। সে-সব পাণ্ডুলিপি কোথায় গেছে কে জানে। 'ভারতী' 'তত্ত্ববোধিনী', আরো কত কাগজে কত কি লিখেছি, সবটার কি আর পাণ্ডুলিপি রেখেছি। গল্প করছ গল্প করো। পাণ্ডুলিপি দিয়ে তোমার কি হবে। আমার যে-সব লেখা ছাপার অক্ষরে বেরিয়েছে তাও কি তুমি পড়েছ?' তাঁর এই কথা শুনে আমি বলেছিলাম, 'আপনার সব লেখা আমি না পড়লেও আপনার

'গীতাপাঠ' ভালো করে শুনেছি, আর পড়েছি আপনার স্বপ্নপ্রয়াণ।' আমার কথা শুনে তিনি বলেছিলেন, 'গীতাপাঠ শুনে কি বুঝলে আর স্বপ্নপ্রয়াণ পড়েই বা কি বুঝলে বলো?' আমি বললাম, 'যা বুঝেছি তা বুঝিয়ে বলবার ক্ষমতা আমার নেই। আপনার দর্শনশাস্ত্র-সম্বন্ধীয় কয়েকটি লেখাও পড়েছি। সেই-সব লেখার বক্তব্য বিষয় যা বুঝেছি তা বুঝিয়ে বলবার মতন শক্তি আমার নেই। সে শক্তি থাকলে লেখাপড়া একটু ভালো করে করতাম এবং পণ্ডিত মহলে ছোটো বড়ো যা হোক একটা আসন পেতাম।' আমার কথা শুনে তিনি হেসে বললেন, 'সাধে কি তোমাকে N. P. P. (অর্থাৎ না-পড়ে পণ্ডিত) বলি। তুমি একটি বাক্যবাগীশ। এমনভাবে সব কথাবার্তা বল যেন কতই পড়েছ।' আমি হেসে বললাম, 'পড়াশুনা যদি বেশি করতাম তা হলে সবজান্তার মতন অনর্গল কথা বলতে পারতাম না।' এই শুনে তিনি বললেন, 'এর প্রমাণ তো রোজই পাচ্ছি। থাক্ আর বেশি কথা বলে দরকার নেই। যা খাচ্ছ খাও।' সেদিন তখন তিনি তাঁর সান্ধ্যভোজন করছিলেন। আমাকেও স্বতন্ত্র একটি প্লেটে খাবার তুলে তুলে দিচ্ছিলেন। এ-রকম ঘটনা প্রায়ই ঘটত।

দ্বিজেন্দ্রনাথ যৌবনকালে এবং তার পরেও বহু বৎসর ধরে কলকাতায় সমাজ-সংস্কারের নানা কাজে সেই কালের অনেক প্রখ্যাত প্রগতিশীল ব্যক্তিদের সঙ্গে তিনি নানা ভাবে অল্পবিস্তর যুক্ত ছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর সমকালীন প্রগতিশীলদের অন্যতম হলেও, তিনি ছিলেন স্বদেশীভাবাপন্ন। ইংরেজি কায়দায় পোশাক-পরিচ্ছদ তিনি ব্যবহার করতেন না, ইংরেজি ধরনের চালচলনও তিনি পছন্দ করতেন না। তর্ক-যুক্তি-বিচারের দিক দিয়ে সমাজের প্রয়োজনীয় বিষয় সংস্কারে যোগ দিলেও তিনি চাইতেন যে সংস্কারের হাবভাব, ধরনধারণ হিন্দু সংস্কৃতির বিরুদ্ধে না হোক। তিনি নিজেকে বলতেন 'আমি ব্রাহ্মসম্প্রদায়-অন্তর্গত হিন্দু।' দ্বিজেন্দ্রনাথের হিন্দুত্ব কোনো সাম্প্রদায়িক গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল না। তাঁর হিন্দুত্ব ছিল উপনিষদের

হিন্দুত্ব। তাঁর এই উদার সাম্প্রদায়িকতাহীন মনোভাবের জন্যই অ্যাণ্ড্রুজ, পিয়ার্সন তাঁকে অগাধ শ্রদ্ধা করতেন।

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে আমি দ্বিজেন্দ্রনাথের সান্নিধ্যলাভের সুযোগ পেয়েছিলাম। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি কিংবা হয়তো ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দু-তিন মাসের মধ্যে আমি শান্তিনিকেতনে ছাত্ররূপে এসেছিলাম। যখন এসেছিলাম তখন থেকেই যে তাঁর সান্নিধ্য পাবার সম্পূর্ণ সুযোগ পেয়েছিলাম তা নয়। প্রথম প্রথম আমরা কয়েকজন ছাত্র দূরের থেকেই 'বড়োবাবু'কে (দ্বিজেন্দ্রনাথ) মাঝে মাঝে দেখে আনন্দ পেতাম, খুব কাছে ঘেঁষবার মতো সাহস হত না সুযোগ থাকলেও। কারণ বেশ কিছুদিন পর্যন্ত আমাদের এ কথা জানা ছিল না যে বড়োবাবুর কাছে গেলে আমরা তাঁর আদর স্নেহ সহজেই পাব এবং এও জানতাম না যে তিনি আশ্রমের ছেলেদের ভালোবাসেন। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে দ্বিজেন্দ্রনাথের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা ছাড়া শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রায় সকলের কাছেই দ্বিজেন্দ্রনাথ 'বড়োবাবু' বলেই পরিচিত ছিলেন। এর দুটি কারণ ছিল, প্রথম কারণ ঠাকুরবাড়ির সকল স্তরের কর্মচারীরাই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বড়োবাবু বলতেন এবং এই রীতি অনুসারেই তাঁর অন্যান্য ভাইদেরও মেজবাবু, সেজবাবু, ছোটোবাবু বলতেন। ছোটোবাবু বলতেন রবীন্দ্রনাথকে। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে তখনকার দু-জন শিক্ষক যথা হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জগদানন্দ রায় শান্তিনিকেতনে আসবার পূর্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এস্টেটে কর্মচারী ছিলেন। যখন রবীন্দ্রনাথ এস্টেটের দেখাশোনা করতেন তখন এই দু-জন ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের ফলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে জমিদারি মহাল হরিবাবু এবং জগদানন্দবাবুর উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র নয়, তাঁদের যোগ্যতা অনুযায়ী তাঁদের প্রকৃত কর্মক্ষেত্র শান্তিনিকেতন। এই বিচারের দ্বারা চালিত হয়ে তিনি জগদানন্দবাবু এবং হরিবাবুকে এস্টেটের কাজ থেকে

সরিয়ে এনে শান্তিনিকেতনে শিক্ষক পদে নিযুক্ত করেন। তাঁরা শান্তিনিকেতনে এসে দ্বিজেন্দ্রনাথকে এবং রবীন্দ্রনাথকে পূর্বাভ্যাস অনুযায়ী যথাক্রমে 'বড়োবাবু' এবং 'ছোটোবাবু' বলতেন। আমার স্মরণে আসে না কখনো তাঁদের বলতে শুনেছি দ্বিজেনবাবু কিংবা রবিবাবু। যখন তাঁরা সামনাসামনি দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছে উপস্থিত হয়ে কোনো কথা বলতেন, সম্বোধন করতেন 'বাবুমশায়'। রবীন্দ্রনাথকেও সম্বোধন করতেন 'বাবুমশায়'। পরে রবীন্দ্রনাথের অসাক্ষাতে জগদানন্দবাবু এবং হরিবাবু আমাদের কাছে কথাবার্তা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেবও বলতেন। কিন্তু বেশির ভাগই বলতেন বাবুমশায়। দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের পত্নী হেমলতা দেবী শান্তিনিকেতনে পরিবারবর্গের লোক ব্যতীত সকলের কাছেই 'বড়োমা' বলে পরিচিত ছিলেন। শিক্ষক, ছাত্র, দ্বিজেন্দ্র-নাথের ভৃত্য, এস্টেটের কর্মচারীরা সকলেই তাঁকে 'বড়োমা' বলতেন। আমরাও তাঁকে বড়োমা বলেই সম্বোধন করতাম। দ্বিজেন্দ্র-নাথের দেহত্যাগের কয়েক বৎসর পরে বড়োমা পুরীতে বসন্তকুমারী বিধবাশ্রমের কর্ত্রী হয়ে চলে যান। দীর্ঘকাল সেখানে প্রধান কর্ত্রী রূপে থেকে সংপ্রতি পুরীতে পরলোকগমন করেছেন।

বড়োবাবুর কাছে গিয়ে গল্পসল্প করবার এবং তাঁর কথা শোনবার সুযোগ পাবার পূর্বে একটা মস্ত সুযোগ ঘটেছিল বড়োমার স্নেহ পাবার। বড়োমা থাকতেন নিচুবাংলায়। বড়োবাবুকে দেখাশোনার, বড়োবাবুর আহারাদির ব্যবস্থা করার যাবতীয় দায়িত্ব ছিল বড়োমার। তাঁর তত্ত্বাবধানে এককালে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিশুবিভাগের ছাত্রদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা নিচুবাংলাতেই হত। মধ্যাহ্নভোজন এবং সান্ধ্যভোজনের সময়, সেইকালের শিশু-বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক রূপে আমি এবং তেজেশবাবু ছাত্রদের নিয়ে নিচুবাংলায় যেতাম এবং ছাত্রদের সঙ্গেই খাওয়াদাওয়া করতাম। খাওয়াদাওয়া হত বড়োমার শোবার ঘরের দক্ষিণের লম্বা বারান্দায়। সেই বারান্দায় ছেলেরা এবং আমরা আসন করে লাইন বেঁধে বসতাম,

আর শালপাতায় আমাদের খাদ্য পরিবেশন করা হত। ছেলেদের লম্বা লাইনের দশ-বারো জন ছেলের মাঝখানে আমি আর তেজেশবাবু বসতাম ছেলেদের সঙ্গেই খেতে। ছেলেদের সঙ্গে আমাদের বসবার কারণ ছিল— তারা বড়োমার স্নেহের সুযোগ নিয়ে খাবার সময় 'বড়োমা আমাকে এটা দিন, বড়োমা আমার পাতে মোটে একটা পটল পড়ল, ওর পাতে কেন দুটো পটল পড়ল, আমাকে আর-একটা পটল দিতে বলুন' এইরকমের নানা দাবি জানিয়ে হৈ-চৈ করত। তাদের এই হৈ-চৈ-এর তাল আমাকে আর তেজেশবাবুকে সামলাতে হত। বড়োমাও যে তাল সামলাতেন না তাও নয়, কিন্তু ছেলেরা আমাদের যতটা ভয় করত তার তুলনায় খুব অল্পই ভয় করত বড়োমাকে— ভয় করত না বললেই হয়। তখন আমরা শিক্ষক পর্যায়ে উন্নীত হলেও ছিলাম যুবক। বড়োমা আমাদেরও ঐ ছেলেদের মতনই স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন, সেইজন্যেই খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে মাঝে মাঝে আমি আর তেজেশবাবু 'এটা হলে আরো ভালো হয়, কালকে কপির ডালনা বেশি করে করতে বলবেন' ইত্যাদি দু-একটা আবদার যে না করতাম তা নয়। বড়োমা অসীম ধৈর্যের সঙ্গে ছেলেদের এবং আমাদের আবদার রক্ষা করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। ছেলেদের জন্যে রান্না তরিতরকারি বেশির ভাগ উনি নিজেই কুটতেন। পাচক নরেনঠাকুরও প্রয়োজনমত তরকারি কোটায় বড়োমাকে কখনো কখনো সাহায্য করতেন। খাবার সময় বড়োমা আগাগোড়া উপস্থিত থেকে দেখতেন কার পাতে কি পড়েছে আর কি পড়ে নি, কেই বা পাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিয়ে কোনো পদ না খেয়ে পাতেই নষ্ট করছে। এ-সব দিকে বড়োমার সতর্ক নজর ছিল। যেটাতে অনাবশ্যক বেশি খরচ না হয় সে বিষয়ে তিনি ছিলেন খুব সাবধান। সেই সময় শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা আদবেই স্বচ্ছল ছিল না। এই অস্বচ্ছলতার মধ্যেই যাতে শিশুবিভাগের ছেলেদের খাওয়াদাওয়া ভালো হয় সেইজন্যেই শিশুবিভাগের ছেলেদেব খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা শান্তিনিকেতনের

সেই সময়ের সাধারণ পাকশালায় না রেখে বড়োমার তত্ত্বাবধানে নিচুবাংলাতেই করা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের অনুরোধক্রমে। গুরুদেবের সেই অনুরোধকে বড়োমা শ্রদ্ধার সঙ্গে শিরোধার্য করে কর্তব্য পালন করতেন। বিদ্যালয়ের অর্থকোষ থেকে শিশুবিভাগের ছেলেদের খাওয়াদাওয়ার জন্য যে টাকার অঙ্ক বরাদ্দ ছিল, বড়োমা যেমন করে ছেলেদের খাওয়াতেন তাতে সে টাকায় ছেলেদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যয় কুলোতো না। অতিরিক্ত যা ব্যয় হত বড়োবাবুর তহবিল থেকে। এই ব্যয়ের টাকার অঙ্ক খুব কম ছিল না। কিন্তু এ-কথা বড়োমার স্বামী দ্বিপুবাবু এবং বড়োবাবুও রবীন্দ্রনাথকে কখনো জানতে দেন নি। দ্বিপুবাবু তখন ছিলেন শান্তিনিকেতনের অর্থসচিব। বড়োবাবুর তহবিলে তখন মাসে মাসে জমিদারি থেকে কত টাকা আসত এবং কি ভাবেই তা সংসারে খরচ হত তার খুঁটিনাটি হিসেব বড়োমা এবং দ্বিপুবাবুই জানতেন, বড়োবাবু কিছুই জানতেন না; কিন্তু শিশুবিভাগের ছেলেদের খাওয়াদাওয়ার জন্য যে টাকা ঐ তহবিল থেকে ব্যয় করা হত তা বড়োবাবুর জ্ঞাতসারেই। বড়োবাবু এইভাবে শিশুবিভাগের ছেলেদের জন্যে খরচ করা হচ্ছে জেনে খুবই আনন্দ পেতেন। 'রবির ছেলেরা বৌমার কাছে আদরযত্ন পাক, তাদের খাওয়াদাওয়া ভালো হোক এটা তো আমারও দেখা কর্তব্য'— এই কথা খুব খুশি হয়েই বড়োবাবু বলতেন। এইরকম ভাবে প্রত্যহ নিচুবাংলায় যাওয়া-আসার সুযোগ পেয়েই বড়োবাবুর কাছে ঘেঁষবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

মধ্যাহ্নভোজের আধঘণ্টা আগে আমি একদিন দুঃসাহসীর মতো বড়োবাবু যে ঘরে থাকতেন সেই ঘরের বারান্দায় গিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরেছিলাম। তাঁর ঘরের দরজা ছিল খোলা, চেয়ে দেখলাম তিনি বড়ো একটা ব্রাউন রঙের কাগজ নিয়ে হিসেব করে করে নানা রকমে ভাঁজ করছেন। কৌতূহল হল কাগজ ভাঁজ করে করে কি করছেন সেটা দেখবার। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখবার সাহস হল না। ঘরের বারান্দার এক কোনায় তাঁর ভৃত্য গোষ্ঠ মালী

বসে ছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বড়োবাবু কাগজ দিয়ে কি করছেন?' উত্তরে সে বললে, 'বড়োবাবু কাগজ নিয়ে খেলা করছেন, দোয়াত তৈরি করছেন, বাক্স তৈরি করছেন, নৌকো তৈরি করছেন, এইরকম যেদিন যা খুশি করেন!' গোষ্ঠ মালীর কথা শুনে আমার কৌতূহল আরো বেড়ে গেল। মনে আর একটু সাহস সঞ্চয় করে দরজার চৌকাঠের দেয়ালে ঠেস দিয়ে একদৃষ্টে বড়োবাবুর ছোটো টেবিলের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কয়েক মিনিট পরেই হঠাৎ বড়োবাবুর নজর পড়ল আমার দিকে। আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি চাই?' আমি একটু ভয় পেলেও বললাম, 'আপনি কি করছেন তাই দেখছি, কিছু চাই না।' আমার কথা শুনে তিনি সস্নেহে বললেন, 'ভিতরে এসো, এখানে বসে দেখ কি করছি।' তাঁর কথা শুনে আমি ঘরের ভিতরে ঢুকে টেবিলের পাশের একটা মোড়ায় বসলাম, মোড়ায় বসার আগে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিলাম। মোড়ায় বসতেই তিনি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। পরিচয় বেশ ভালো করেই দিলাম। তাঁকে বললাম, 'আমি, শান্তিনিকেতনের এক সময়ের শিক্ষক সতীশচন্দ্র রায়ের ভাগ্নে' ইত্যাদি। আমার কথা শুনেই তিনি আনন্দে বললেন, 'ওঃ তুমি সতীশের ভাগ্নে! কতদিন হল এখানে এসেছ? কি করছ' ইত্যাদি। তাঁর প্রশ্নের পর প্রশ্নের জবাব স্বচ্ছন্দেই দিলাম। তার পর তিনি নিজে থেকেই বললেন, 'আচ্ছা এখন যাও, খাওয়াদাওয়া করো। এই-সব কাগজ দিয়ে যা তৈরি হবে তার কিছু কিছু তোমাকে উপহার দেব। কাল বিকেলে এসো।' আমি তখন তাঁকে আবার প্রণাম করে বেশ আনন্দে নিচু-বাংলার অন্দরমহলে খাওয়ার জন্যে ঢুকলাম। খাবার ঘরের বারান্দার কাছে এসে দেখি খাওয়াদাওয়ার পাট প্রায় শেষ। আমাকে দেখেই বড়োমা এবং তেজেশবাবু কতকটা ভর্ৎসনার স্বরে কৈফিয়ত তলব করলেন কেন আমি খাবারের সময় উপস্থিত ছিলাম না ইত্যাদি। বড়োমা বকুনি দিয়ে বললেন, 'তোমার জন্যে এতক্ষণ আমরা

ব্যস্ত হয়ে খোঁজ করছিলাম। গেল কোথায় সুধাকান্ত।' আমি কোথায় গিয়েছিলাম খুলে বললাম। আমার কথা শুনে বড়োমা ধমক দিয়ে বললেন, 'ওখানে যাবার আর সময় পাও নি। ছেলেদের সঙ্গে তোমার বসে খাবার কথা, নিজের কর্তব্য ভুলে যাও কেন?' বড়োমার সব বকুনি চুপ করে হজম করলাম। লক্ষ্য করলাম ছোটো ছোটো ছেলেরা ভারি খুশি, আমি বকুনি খাচ্ছি দেখে। তারা বেশ আনন্দে হৈ-চৈ করে বড়োমাকে বললে, 'বড়োমা, সুধাকান্তদা আমাদের প্রায়ই বকেন। আজ সুধাকান্তদা আপনার কাছে জব্দ। খুব মজা হয়েছে' ইত্যাদি। যাই হোক, বকুনি খাবার পর মধ্যাহ্নের খাবারও খেলাম। বকুনি দিয়েছিলেন বলে বড়োমার মনে পরে একটু দুঃখ হয়েছিল, তাই খাবারের পাতে অতিরিক্ত পেলাম একটা সুখাদ্য সন্দেশ।

পূর্বেই বলেছি যে আমরা শিক্ষক পদে উন্নীত হয়েছিলাম। এই ষোলো-সতেরো বছর বয়সে, শিক্ষক বলতে যা বোঝায় তেমন শিক্ষক আমি ছিলাম না। ছোটো ছোটো ছেলেদের উপযোগী বাংলা পাঠ্যপুস্তক পড়াতাম। সেই বইগুলো ছিল সহজ যেমন 'ছেলেদের রামায়ণ' 'ছেলেদের মহাভারত' ইত্যাদি। এ বইগুলো তো গল্পের বই। গল্পের বই পড়াতে এবং যতটুকু ছোটো ছেলেদের দরকার গল্পের পাত্র পাত্রীদের পরিচয়টা যা বইয়ে থাকত তার চেয়েও একটু বেশি বুঝিয়ে দিতাম। তবে রবীন্দ্রনাথের নির্দেশক্রমে ছেলেদের যেদিন যতটুকু পড়াতাম সেইটুকু তাদের নিজের ভাষায় লিখে আনতে বলতাম, তারা লিখেও আনত। তাদের লেখায় যা ভুলত্রুটি থাকত তা সংশোধন করে দিতাম। এইভাবে আমরাও নিজেদের ভাষায় লিখতাম মুখে মুখে যে-সব বিষয় রবীন্দ্রনাথ আমাদের বলতেন ক্লাসে। এ-কথা তো অনেকেরই জানা আছে যে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সময় সুযোগ মতো রবীন্দ্রনাথ ইংরাজি এবং বাংলা পড়াতেন এবং সেই পড়ানো যতদিন চলত বাঁধাধরা ক্লাসের রুটিনের মতোই। তিনি ঘড়িধরা সময়ে ক্লাসে এসে উপস্থিত হতেন। তাঁর ক্লাসে যখন

তিনি পড়াতেন তখন শিক্ষার্থীদের কারো পক্ষে অন্যমনস্ক হবার উপায় ছিল না। বড়োবাবুর সঙ্গে যখন মেলামেশা করবার সুযোগ ক্রমশ বেড়ে চলল তখন তাঁর অনেক কথা আমি নিজের ভাষায় যেন আমিই রচনা লিখছি এরকম ভাবে লিখে দুঃসাহসীর মতন তাঁকে পড়ে শোনাতাম। কিন্তু এখানে বলা প্রয়োজন মনে করি যে আমার পড়ে শোনানোর প্রতিক্রিয়া দুই ভাইয়ের মধ্যে অর্থাৎ গুরুদেব এবং বড়োবাবুর মধ্যে দুই রকমের ছিল। গুরুদেব আমার লেখার মধ্যে ত্রুটিবিচ্যুতি থাকলে বলতেন, 'হয়েছে, কিন্তু যেমনটি হওয়া উচিত তেমনটি হয় নি, আবার লিখতে হবে।' এই বলে আবার সেই লেখার বিষয়বস্তু ভালো করে ধীরে ধীরে বুঝিয়ে দিতেন; বুঝিয়ে দিয়ে বলতেন, 'আবার লিখে এনে আমাকে দেখিয়ো।' এই-সব কথা বলতেন একটুও উত্তেজিত এবং বিরক্ত না হয়ে। কিন্তু বড়োবাবুর বেলায় ব্যাপার অন্যরকম হত। আমার লেখায় ভুলত্রুটি থাকলে, লেখা শোনা মাত্র খুব দাবড়ে দিতেন। বলতেন, 'কিছু বোঝ নি, তোমার মাথায় কিছু ভালো করে ঢোকে নি। আমি যখন তোমাকে কিছু বোঝাই তখন তোমার মন কোথায় থাকে।' মিনিটখানেক কিংবা দুয়েকের মতো বকুনির একটা ঝড় বয়ে যেত। তার পরেই সে ঝড় এমনভাবে অকস্মাৎ থেমে যেত যে, এক মুহূর্ত আগে ঝড় যে বইছিল তা আন্দাজ করারও সাধ্য ছিল না কারো। আবার শান্তভাবে যা লিখেছিলাম বেশ ভালো করে বুঝিয়ে বলতেন। এইরকম ভাবে বকুনি খাবার কিংবা হজম করবার পুরস্কারও পেতাম। এই পুরস্কার ছিল মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে বসে সান্ধ্যভোজন করা। গুরুদেবের কাছে, বড়োবাবুর কাছে, বড়োমার কাছে যখন-তখন আমার যাওয়া-আসার ব্যাপারটা ক্রমশ নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। এসম্বন্ধে শ্রীসুধীরঞ্জন দাস তাঁর 'আমাদের শান্তিনিকেতন' স্মৃতিকথায় লিখেছেন: 'কিছু আগে-পিছে এসেছিলেন সুধাকান্ত রায়চৌধুরী। স্কুলের পড়াশুনার চেয়ে কীটপতঙ্গের প্রতিই তাঁর আকর্ষণ ছিল বেশি। পিঁপড়ের

বাসা এবং উইঢিবির যাবতীয় নকশা তাঁর জানা ছিল। গুটিপোকা পোষা ছিল তাঁর এক বাতিক। এ-সব বিষয়ে কিছু কিছু রচনাও তিনি প্রকাশ করেছিলেন। বয়সে নবীন হলেও গুরুদেব ও দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রবীণদের মহলেই ছিল তাঁর আনাগোনা— তাঁর কথাবার্তা বলবার ধরনটাও ছিল বিজ্ঞের মতো। বড়োদের সঙ্গে জমে যাওয়ার এই অভ্যাসটা ছিল বলে সুধাকান্তর ঘন ঘন ডাক পড়ত নিচুবাংলায় এবং সেই সূত্রে তিনি বড়োমার দাওয়ায় পাত পাতবার কায়েমী বন্দোবস্তও করে ফেলেছিলেন। সমান রসবোধ ছিল তাঁর সাহিত্যে ও ভোজ্য সামগ্রীতে। এখন তিনি শ্রীনিকেতনের পাবলিক রিলেশন্‌স্‌ অফিসার বা জনসংযোগ-সচিব। সাময়িক পত্রে প্রকাশিত তাঁর রবীন্দ্রস্মৃতিকথায় গুরুদেবের জীবনের অনেক বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।'

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন আমাদের ছাত্র অবস্থায়। আমাদের দু-জনের বয়সও কাছাকাছি। তিনি আমার চেয়ে বছরখানেকের বড়ো। এই সুধীরঞ্জনদাই, আমি বড়োবাবুর কাছে, গুরুদেবের কাছে ও হেমলতা দেবীর কাছে গিয়ে যে-সব প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা করি সে-সব আলোচনা করবার মতন পড়াশোনার দিক দিয়ে আমার কোনোই অধিকার নেই বলে আমাকে একবার বলেছিলেন, 'ভাই সুধাকান্ত, তুমি বড়ো দুঃসাহসী।' উত্তরে আমি বলেছিলাম, 'ভাই, এই দুঃসাহসিকতাই আমার গুণ, এই গুণেই আমি এঁদের কাছে ঘেঁষতে পারি, আমার তো আর-কোনো গুণ নেই।'

পূর্বেই বলেছি একদিন কৌতূহলবশত বড়োবাবু যখন কাগজ ভাঁজ করে করে কিছু-একটা তৈরি করবার আয়োজন করছিলেন আমি তাঁর ঘরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম— তার পর তাঁর ঘরে ঢুকে কি কি কথাবার্তা হয়েছিল। তার পরদিন, তাঁর পূর্বদিনের নির্দেশ-মতো ঠিক সময় তাঁর ঘরে উপস্থিত হতেই তিনি আমাকে বললেন, 'এই যে এসেছ, তোমার জন্যে এই দেখ কয়েকটা জিনিস তৈরি করে

রেখেছি।' এই বলে ঐ টেবিলের পাশেই আর একটি ছোট্ট টেবিলে রাখা কাগজের ভাঁজে তৈরি গুটিছুয়েক ছোট্ট ছোট্ট নৌকো, গুটি-তিনেক দোয়াতের কলমরাখা চৌকোনা খোপ, আর গুটিতিনেক ছোটো ছোটো কাগজের পেঁটরা আমাকে এগিয়ে দিলেন। আমি নিয়ে সেগুলি তাঁর সামনে বসেই একাগ্রচিত্তে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলাম। অবাক হলাম জেনে যে ঐ-সব জিনিস তৈরি হয়েছে কোনোরকম আঠার সাহায্য না নিয়ে এবং কোনোরকম সেলাই ফোঁড়াই না করেই— শুধুমাত্র কাগজের ভাঁজের বিচিত্র কৌশলে। একটা ভাঁজের মধ্যে আর-একটা ভাঁজ এমন কৌশলে সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা দেখলে মনে হয় আঠা দিয়ে জোড়া, শক্ত মজবুত। সেইগুলো নিয়ে আমি বেশ আনন্দে ফিরে এলাম আমার নিজের বাস-কক্ষে। তার পর মনে হল একটা নৌকোর ভাঁজ খুলে খুলে দেখি কেমন করে নৌকাটি তৈরি হল, যেমনি ভাবা অমনি কাজ, কাজ তো না— অকাজ। ভাঁজ খুলতে গিয়েই বুঝলাম খুব সন্তর্পণে ধৈর্য ধরে একটির পর একটি ভাঁজ খুলতে হবে, নইলে খুলতে গিয়ে ছিঁড়ে যেতে পারে। কোনো রকম করে খোলা শেষ করলাম। খোলা শেষ করে দেখলাম ফুল্‌স্‌ক্যাপ সাইজের একটি গোটা পাতা, কোথাও আঠা দিয়ে জোড়াতাড়ার চিহ্নমাত্র নেই, কেবল ভাঁজের খেলা। তার পরে বিভ্রাট— চেষ্টা করলাম ঐ ভাঁজ মিলিয়ে মিলিয়ে আবার নৌকোটা তৈরি করতে পারি কিনা, কিছুতেই পারলাম না। পারলাম তো না-ই, উলটে ঐ কাগজে অপটু কৌশল খাটাতে গিয়ে তিন-চারটি নতুন ভাঁজ হয়ে গেছে। কি আর করি, সেই কাগজটিকে সযত্নে নিজের ডেস্কের ভিতরে রেখে দিলাম। এই দুঃসাহসিক কল্পনা করে যে তার পরদিন বড়োবাবুর কাছে গিয়ে তাঁকে বলব আমার সামনে তিনি যেন ঐ কাগজটিকে আবার একটি নৌকোয় পরিণত করেন। তার পরদিন সকালে তাঁর ঘরে প্রবেশ করতেই তিনি বললেন, 'উপহারগুলি কেমন লাগল?' আমি বললাম, 'ভালোই লেগেছে, আমার ডেস্কের মধ্যে যত্ন করে

তুলে রেখেছি, পাছে শিশুভাগের দুষ্টু ছেলেরা ঐগুলো নিয়ে খেলা করে নষ্ট করে ফেলে, কাগজের জিনিস তো। কিন্তু'— আমার মুখে কিন্তু শুনেই তিনি বলে উঠলেন, 'কিন্তু আবার কি?' সাহসের উপর ভর করে বললাম, 'একটা নৌকোর ভাঁজ খুলে খুলে চেষ্টা করে দেখছিলাম ভাঁজ মিলিয়ে মিলিয়ে আমি নিজেই ঐ কাগজটাকে নৌকোয় পরিণত করতে পারি কিনা।' তিনি তখন যেন একটু খুশি হয়েই বললেন, 'দেখি কেমন ভাঁজ মিলিয়ে মিলিয়ে নৌকো করেছ?' তাঁর কথা শুনে আমার প্রাণ তো প্রায় খাঁচাছাড়া হবার মতো। ভয়ে ভয়ে পকেট থেকে সেই কাগজটা বের করে তাঁর টেবিলের উপর রেখে দিয়ে বললাম, 'অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও ভাঁজ মিলিয়ে মিলিয়ে নৌকো তো তৈরি করতেই পারলাম না, উলটে কাগজে কতকগুলি বাজে ভাঁজ হয়ে গেল।' তিনি ঐ কাগজ দেখে কয়েক সেকেণ্ড গম্ভীর হয়ে বললেন, "করেছ কি, নৌকো তো নষ্ট করেইছ, কাগজের ভাঁজগুলোকেও নষ্ট করেছ। তুমি আবার বললে শিশুবিভাগের ছেলেরা ঐগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করে নষ্ট করে দেবে! তুমিও তো দেখছি নষ্ট করার ওস্তাদ? জ্যামিতি পড়েছ?' আমি তৎক্ষণাৎ ঢোক না গিলেই বললাম, 'জিওমেট্রি, অ্যালজেব্রা এগুলো ক্লাসে পড়ার জন্য কিনেছিলাম বটে, কিন্তু কিছুতেই এগুলো মাথায় ঢোকে না। বইগুলো কেনাই সার হয়েছে।' আমার কথা শুনে তিনি বললেন, 'তা হলে ক্লাসে পরীক্ষার সময় কি হত?' আমি বললাম, 'কিছুই হত না, পাসও করতাম না ফেলও হতাম না, সব ক্লাসে যেতামও না, যে-যে ক্লাসে যেতে ভালো লাগত সেই সেই ক্লাসে যেতাম।' তিনি বললেন, 'তোমার ভাঁড়ে যে কোনো বিদ্যা নেই সে তো কাগজের দুর্দশা দেখেই বুঝতে পারছি। এখন কি করতে হবে আমাকে?' আমি মাথা চুলকে বললাম, 'আপনি আমার সামনে এই কাগজ ভাঁজ করে করে নৌকো তৈরি করা শিখিয়ে দিন।' তিনি বললেন, 'এ কাগজের মাথাটি তো খেয়েছ, চারি দিকে দুমড়ে দামড়ে গেছে, আর-একটা নতুন কাগজ দিয়ে তৈরি করতে

হবে, এখন আমার সময় নেই, আর-একদিন এসো।' আমি বেশ গম্ভীর হয়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কবে কোন্ সময় আসব ?' তিনি উত্তরে বললেন, 'যদি আগ্রহ থাকে তবে তোমার অবসরমতো দু-একদিন পরে এসে একবার উঁকি মেরে দেখো, যদি সে সময়ে আমার কোনো কাজ না থাকে তা হলে কেমন করে নৌকো তৈরি করতে হয় দেখিয়ে দেব।'

'অবসর' বুঝে তার পর আর যেতে হল না। পরের দিনই সকাল-বেলায় গোষ্ঠ আমার ঘরে এসে হাজির। তখন আমি থাকতাম বীথিকাগৃহে শিশুবিভাগের ছেলেদের সঙ্গে কতকটা গৃহাধ্যক্ষের মতো। সে এসেই বললে, 'বাবামশায় আপনাকে এক্ষুনি ডেকেছেন। চলুন শিগ্‌গির চলুন।' গোষ্ঠর কথা শুনে আমি আর বিলম্ব না করে তার সঙ্গেই গিয়ে হাজির হলাম বড়োবাবুর কাছে। তাঁর কাছে পেঁছিবার আগে পথে যেতে যেতে ভাবছিলাম হয়তো গিয়ে দেখতে পাব বড়োবাবু কাগজের কৌটো, নৌকো তৈরি করার আয়োজন করে বসে আছেন। কিন্তু গিয়ে দেখলাম সে-সব আয়োজন কিছুই নেই। তিনি তাঁর বেতে-বোনা চেয়ারে দিব্যি আরাম করে বসে আছেন। আমাকে দেখেই বললেন, 'আজ আর নৌকো-টৌকো তৈরি করা হবে না। এসো, আমার কাছে বোসো।' পাশেই একটা মোড়াতে বসলাম। মোড়ায় বসতেই তিনি বললেন, 'আমি বৌমার কাছে শুনলাম তুমি রবির ছেলেদের সঙ্গে দলপতি হয়ে এসে এখানে খাওয়াদাওয়া কর। এ-কথা শুনে আমার একটু ভয় হয়েগেছে, দেখো তুমি ঐ-সব ছোটো ছোটো ছেলেদের নিয়ে দল বেঁধে আমার এই কাগজের খেলা দেখতে এসো না। তারা এলে আমি আর তাদের তাল সামলাতে পারব না। আমার সব কাজ ভণ্ডুল হয়ে যাবে, তা ছাড়া তারা যখন-তখন এলে আমার অনেক প্রিয় বন্ধু ভয়ে আর আমার কাছে সহজে আসবে না।' এই বলে বেশ প্রশান্তভাবে আমার দিকে তাকালেন। আমি তাঁর কথার শেষাংশের মর্মটা ঠিক বুঝতে না পেরে তাঁকে

জিজ্ঞাসা করলাম, 'শিশুবিভাগের ছেলেরা আপনার এখানে আসা-যাওয়া করলে আপনার বন্ধুরা পালিয়ে যাবে এ-কথাটার ঠিক মানে বুঝতে পারলাম না।' তিনি একটু মুচকি হেসে বললেন, 'ওঃ, তুমি জান না, সকালে বিকেলে জলযোগের সময় আমার টেবিলে, আমার গায়ে সব বন্ধুরা এসে জড়ো হয়, তারা কেউ লেজ নাড়ে, কেউ পা দিয়ে আমার গা আঁচড়ে দেয়, কেউ পাখনা ঝাড়ে, কেউ লাফালাফি করে, আবার কেউ কেউ নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করে। আমার কাছে আসবার এদের সব বাঁধাধরা সময় আছে। এরা রোজই ঠিক সময়মতো আসে। কেউ কেউ একটু দুষ্টু, যখন-তখন কাছে এসে উপদ্রব করবার চেষ্টা করে, এই দুষ্টুদের সংখ্যা কিন্তু বেশি নয় দু-চারিটি। এই দেখো-না, তোমাকে ঘরে ঢুকতেই দেখেই একজন আমার টেবিলের উপর থেকে পালিয়ে গেল।' তিনি কথা বন্ধ করতেই আমি বললাম, 'কাউকে তো দেখলাম না, দেখলাম একটা শালিক পাখি উড়ে গেল। আমার কথা শুনে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি তো ভারি বেরসিক, আমার কথাবার্তা থেকে তুমি বুঝতে পারলে না, যাদের কথা বলছি তারা মনুষ্যজাতীয় জীব নয়। বেশ, তুমি কাল সকালে এসো, ঠিক এ সময় না, এর একটু আগে, কিন্তু ঘরে ঢুকো না, ঐ দূরে আমলকিতলায় দাঁড়িয়ে চুপটি করে দেখো যাদের কথা বলছি তারা কারা আর তারা কেমন করে আমার সঙ্গে আড্ডা জমায়। খবরদার, তখন কিন্তু কাছে এসো না, কাছে এলেই ওদের মজলিস ভেঙে যাবে।' বড়োবাবুর কথাগুলো সবই হেঁয়ালির মতো ঠেকতে লাগল। সেইসঙ্গে তার পরদিন ঠিক সময় তাঁর ঘরের বারান্দায় পূর্ব দিকে আমলকি গাছতলায় দাঁড়াবার আগ্রহটা বেড়ে উঠল।

আমি মোড়া ছেড়ে উঠতেই তিনি বললেন, 'বোসো, কিছু জলযোগ করে যাও'—এই বলে টেবিলে পিরিচে-ঢাকা চকোলেট কিংবা লজেন্স গোছের এক মুঠো আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'এই নাও, খেতে খেতে এখন চলে যাও নিজের জায়গায়। কিন্তু সাবধান,

এ-সব কথা তোমার ছেলেদের বোলো না।'

তার পরদিন যথাসময়ে নিচুবাংলায় গিয়ে একটি আমলকি গাছের তলায় কতকটা লুকিয়ে থাকার মতো করে দাঁড়িয়ে রইলাম। দূরের থেকে তাকিয়ে দেখলাম দক্ষিণের বারান্দায় বড়োবাবু তাঁর চেয়ারে বসে আছেন, তাঁর সামনে একটি টেবিল পাতা। সেই টেবিলের উপরে ছিল দুই-একটি ছোটো ছোটো প্লেট। দূরের থেকে দেখতে পাই নি সেই প্লেটগুলিতে কি আছে। তবে দেখলাম ঐ টেবিলের উপরে তিন-চার রকমের পাখি ঠোকর দিয়ে দিয়ে প্লেট থেকে কি সব খাচ্ছে। দেখলাম একটা গাছের থেকে নেমে দুটো কাঠবিড়াল দৌড়ে গিয়ে বড়োবাবু চেয়ার বেয়ে টেবিলের উপর লাফ দিয়ে উঠেছে। তাদের বড়োবাবু বিস্কুটের মতো কি একটা পদার্থ ভেঙে ভেঙে দিচ্ছেন। তারা পেছনের দুই পায়ের উপর ভর দিয়ে বসে সামনের দু-পা দিয়ে ধরে যেন ছোটো ছোটো দুটো হাত দিয়ে ধরে সেই খাবার খাচ্ছে। পাখিগুলোও কি সব খাচ্ছে, আর নিজেদের মধ্যে একটু খোঁচাখুঁচিও করছে অর্থাৎ একজন আর-একজনকে ঠোকর মারছে। ঐ টেবিলের থেকে কিছু দূরে একটা কাঠের চেয়ারের মাথায় একটা কাক বসে আছে; সে বসে থাকলেও মাঝে মাঝে দু-একবার টেবিলের উপরে গিয়ে পড়ছে আর বড়োবাবু একটি পাতলা ছড়ি দিয়ে তাকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। তাড়া খেয়ে সে কিন্তু টেবিল ছেড়ে গেলেও বারান্দা থেকে পালাচ্ছে না। টেবিলের পাশে একটা কুকুর নীচে বড়োবাবুর চেয়ার ঘেঁষে বসে ল্যেজ নাড়ছে, সেও কিছু কিছু খাবার পাচ্ছে। এরা হল সকালবেলায় বড়োবাবুর প্রাতরাশের সময়ের মজলিসের সভ্যবৃন্দ। এই সভ্যদের মধ্যেই কুকুরটিই ছিল কেবল পোষা। বাদবাকি সভ্যেরা সব বুনো। নিচুবাংলার এলাকায় আমলকিগাছে, পেয়ারাগাছে এদের ঘরবাড়ি। কাকেরা হয়তো আশ্রম-বিদ্যালয়ের বটগাছ, আমগাছ, তালগাছ আশ্রয় করে থাকত। সেখান থেকেই তারা যথাসময়ে ঐ মজলিসে গিয়ে জুটত। কাকেরা

মজলিসের অন্য সব সভ্যদের কাছে মোটেই বাঞ্ছনীয় ছিল না, কেননা তারা ঐ-সব সভ্যদের খাবার জোর করে কেড়ে নেবার তালে থাকত। এইজন্য বড়োবাবু ঐ পাতলা ছড়িগাছি দিয়েঁ কাকেদের শাসন করতেন অর্থাৎ ভয় দেখাতেন, কিন্তু তাদের গায়ে ছড়ি দিয়ে আঘাত করতেন না। আমি দাঁড়িয়ে দেখছি মজলিসের অদ্ভুত ব্যাপার। কাক যখনই এসে টেবিলের উপর বসবার চেষ্টা করছে অমনি ঐ-সব পাখিগুলো আর কাঠবিড়ালগুলো টেবিল ছেড়ে বড়োবাবুর গায়ে উঠে পড়ছে, কেউ বসছে কাঁধে কেউ আবার মাথায়ও বসছে। একটি জিনিস বিশেষ করে লক্ষ্য করলাম যে এই-সব ব্যাপারের মধ্যেও সভ্যেরা নিয়মকানুন মেনে চলছে, অর্থাৎ তাদের ভোজনপর্ব শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সভ্যেরা যে যার জায়গায় মজলিস ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এই-সব সভ্যেরা চলে যাবার পর কাক সভ্যটি টেবিলে এসে তার প্রাপ্য ভোজ্য খেয়ে যেখানে ইচ্ছে উড়ে গেল। এই মজলিস ভেঙে যাবার পর আমি বড়োবাবুর কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে দাঁড়ালাম। আমাকে দেখেই তিনি বললেন, 'কি হে, আজ তোমার মতলব কি?' তাঁর প্রশ্নের উত্তরে আমি তাঁকে জানালাম আমলকি গাছতলায় দাঁড়িয়ে মজলিসের ব্যাপারটা কেমন করে উপভোগ করছিলাম। তিনি আমার কথা শুনে অট্টহাসি হেসে বললেন, 'কেমন লাগল? দেখলে তো এদের দৌরাত্ম্য! ঐ কাকটাই সবচেয়ে দুষ্টু। ওর মতলব সকলকে তাড়িয়ে দিয়ে ওই-ই সব খাবে। ও কোনো শাসন মানতে চায় না, কেবল ফাঁক খোঁজে কোন্ তালে এসে অন্যদের খাবার খেয়ে নেবে। শুধু কি তাই, ও আবার ছোটো ছোটো কাঠবিড়ালগুলিকে ঠোকর মারে, তাড়া করে। ওটাকে নিয়েই আমার যত ঝঞ্ঝাট, বারবার ছড়ি দেখাই, ভয় দেখাই, তবু কিছুতেই বাগ মানতে চায় না। আমি বলি—ওহে বাপু, তোমার ভাগ তো তুমি পাবেই, ওদের খাদ্যে তোমার ভাগ বসাবার দরকার কি?'

এর পর তিনি বললেন, 'বোসো, এইবার তোমার ভাগ খাও।'

এই বলে তাঁর প্রিয় ভৃত্য মুনীশ্বরকে বললেন, 'সুধাকান্তর জন্য যা রেখেছি এইবার ওকে দাও।' মুনীশ্বর আমাকে একটা প্লেট এনে দিলে। সেই প্লেটে সাজানো ছিল পরিষ্কার করে ধোয়া কয়েকটা মনক্কা, কয়েকখণ্ড ছাড়ানো আখরোট, বাদাম, দুটো বিস্কুট আর যতদূর মনে পড়ে কয়েক কোয়া কমলালেবু, আর একটা সন্দেশ-জাতীয় মিষ্টি। পরম তৃপ্তিসহ বড়োবাবুর কাছে বসেই সেগুলো খেলাম। আমি যখন খাচ্ছিলাম তিনি একটু হেসে বললেন, 'এ-সব খাদ্য কিন্তু ঐ মজলিসের খাদ্য নয়, ওদের জন্য বেশ ভালো করে দলা পাকিয়ে ছাতু দিই, ওরা তাই খায়। আর দু-চার কুচি বিস্কুট, দু-চার কুচি ভিজে আখরোট দিই কাঠবিড়ালগুলোকে, ওরা বেশ কুট কুট করে খায়। খাওয়াদাওয়া সেরে সকলেই কিন্তু একসঙ্গে চলে যায় না। পাখিগুলো উড়ে যায়, কিন্তু এই কাঠবিড়ালগুলো গড়িমসি করে, তারা কেউ আমার কোলের উপর লাফ দিয়ে বসে, কেউ কেউ আবার আমার কাঁধের উপর ঘোরাফেরা করে। শুধু কি এই! দু-একজন আবার আমার ঘরে ঢুকে কাগজপত্রের উপর দৌড়াদৌড়ি করে। এদের আমি তো সব সময় শায়েস্তা করে উঠতে পারি না। মুনীশ্বর মাঝে মাঝে শায়েস্তা করতে চায়, কিন্তু আমি করতে দিই না, পাছে মুনীশ্বর ওদের মার-ধর করে।' তার পর বললেন, 'আজকে আর বেশিক্ষণ নয়, দুটো কাগজের নৌকো নিয়ে বিদায় হও। এখন আমি শাস্ত্রীমশায়ের[১] কাছে যাব, তাঁর সঙ্গে কয়েকটা বিষয় আলোচনা করতে হবে। তুমি আমার সঙ্গে যেতে পার কিন্তু শাস্ত্রীর সঙ্গে যে-সব বিষয় আমি আলোচনা করব সেগুলো তোমার সইবে না।' আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রীমশায়ের কাছ পর্যন্ত গেলাম, গিয়ে তাঁকে এবং শাস্ত্রী-মশায়কে প্রণাম করে সরে পড়লাম সেখান থেকে। কারণ বড়োবাবুর সঙ্গে পথে যেতে যেতেই বুঝতে পেরেছিলাম যে শাস্ত্রী-মশায় আর বড়োবাবুর মধ্যে যে আলোচনা হবে তার বিষয়বস্তু

১ পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী

ছিল দর্শন-সম্বন্ধীয় এবং সে-আলোচনাও পাঁচ-দশ মিনিটে শেষ হবার নয়, বেশ সময় নেবে। আর বুঝতে পেরেছিলাম বড়োবাবুর হাবভাবে যে আলোচনা শুধু আলোচনাই হবে না, হবে কতকটা তর্কযুদ্ধের মতো। শাস্ত্রীমশায়ের কাছে গিয়ে দেখতে পেয়েছিলাম যেন তিনিও কতকটা প্রস্তুত ছিলেন বড়োবাবুকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। বড়োবাবু সেখানে উপস্থিত হতেই শাস্ত্রীমশায় তাঁকে প্রণাম করলেন। তার পরেই দু-জনের আলোচনা শুরু হল। বলা বাহুল্য, এ আলোচনা শুরু হতে হতেই আমি সেখান থেকে সরে পড়েছিলাম। উভয়ের মধ্যে এরকম আলোচনা প্রায়ই হত। কখনো শাস্ত্রীমশায়ের কাছে যেতেন বড়োবাবু, কখনো শাস্ত্রীমশায় আসতেন বড়োবাবুর কাছে। বড়োবাবু প্রায়ই দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে, বৈদিক যুগের কতকগুলি আচারবিচার সম্বন্ধে ছোটো-বড়ো নানা রকম প্রশ্ন কাগজে লিখে শাস্ত্রীমশায়ের কাছে পাঠাতেন। সেই প্রশ্নগুলির তড়িঘড়ি জবাব কাগজে লিখে পাঠানো শাস্ত্রীমশায়ের পক্ষে সম্ভব হত না, তাই তিনি বড়োবাবুর প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য প্রস্তুত হয়েই নিচুবাংলায় যেতেন বড়োবাবুর কাছে। বড়োবাবু যে-সব প্রশ্ন লিখে পাঠাতেন তার উত্তর দেওয়া এবং সে সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হত।

এইরকম প্রশ্নোত্তরের সময় একদিন আমি হঠাৎ কি কারণে উপস্থিত ছিলাম। প্রশ্নটা ছিল বৈদিক যুগের আর্যদের মধ্যে অতিথিকে আপ্যায়ন করবার জন্য গো-বৎস হত্যা করে তার মাংস রন্ধন করার রীতি নিয়ে। সেই রীতির সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন কবে থেকে হিন্দু-সমাজে প্রচলিত হল ? কি কারণে ? এবং কেমন করে গো-হত্যা না করা হিন্দুধর্মের অন্তর্গত হল ? কিংবা কবে থেকেই তা হিন্দু-ধর্মের অন্তর্গত হল ইত্যাদি।

আমি কিছুক্ষণ ঐ ঘরেই বড়োবাবুর শোবার খাটের পাশে একটা মোড়া নিয়ে বসেছিলাম। বড়োবাবু আর শাস্ত্রীমশায়ের আলোচনা বেশ জমে উঠেছিল। আমি কিছু বলবার উপক্রম করছি দেখে

বড়োবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি হে বিজ্ঞ মহাশয়, তুমি কি এখন যাবার চেষ্টায় আছ? তা বুঝতে পেরেছি এ-সব বিষয় তোমার পক্ষে দুষ্পাচ্য, তোমার পক্ষে সরে পড়াই ভালো।' আমি বললাম, 'আজ্ঞে না, আমি সরে পড়বার কথা ভাবছি না। আপনাদের আলোচনা শুনে আমার মনে দুটো প্রশ্ন জেগেছে।' শাস্ত্রীমশায় আমাকে স্নেহ করতেন, তিনি একটু হেসে বললেন, 'কি প্রশ্ন জেগেছে বল্?' আমি বললাম, 'প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে 'হিন্দু' শব্দের ব্যুৎপত্তি কি? দ্বিতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে, সাঁওতাল, মুচি, চামার আর কতকগুলি পাহাড়ী জাতি এরা হিন্দু না অহিন্দু? যদি এরা হিন্দু হয় তা হলে তো এদের মধ্যে অনেককে আমি স্বচক্ষে গোরুর মাংস খেতে দেখেছি। গোরুর মাংস খাওয়া এদের সমাজে নিষিদ্ধও নয়।' এইসঙ্গেই আমি বললাম, 'সুশিক্ষিত হিন্দুসমাজেও বহুজনের কাছে এরা অস্পৃশ্য হলেও এদের হিন্দুই বলা হয়। যদি এদের হিন্দুই বলা হয় তা হলে 'গোরু খাওয়া পাপ' এই ভাব বিরাট হিন্দুজাতি এদের মধ্যে কেন বদ্ধমূল করে দিতে পারে নি?' আমার কথা শেষ হতেই বড়োবাবু অট্টহাসি হেসে বললেন, 'শাস্ত্রীমশায়, N. P. P.-র প্রশ্নের জবাব দিন।' শাস্ত্রী-মশায় বুঝতে পারলেন না বড়োবাবু কেন আমকে N. P. P. বললেন। তাই বড়োবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'N. P. P. মানে কি?' বড়োবাবু বললেন, 'শাস্ত্রীমশায়, ওকে আপনি চেনেন না! ও হচ্ছে ইঁচড়ে পাকা, যখন-তখন বুজরুকি করে, বিজ্ঞ সাজে। সেইজন্যে আমি ওকে না-পড়া পণ্ডিত বলি অর্থাৎ ইংরেজিতে সংক্ষেপে N. P. P. বলি।' বড়োবাবুর কথা শুনে শাস্ত্রীমশায় খুব একচোট হাসলেন, বড়োবাবুরও সেইসঙ্গে অট্টহাসি। সেই হাসাহাসিতে আমি একটু প্রশ্রয় পেলাম এবং নিঃসংকোচে বলে ফেললাম, 'আপনারা আমার প্রশ্নগুলিকে হেসেই উড়িয়ে দিচ্ছেন।' আমার কথা শুনে শাস্ত্রীমশায় বললেন, 'আচ্ছা এখন থাক্, তোর প্রশ্নের জবাব নিশ্চয়ই দেব। আমার কাছে এক সময় যাস্, আমি

তোকে বুঝিয়ে বলব। এখন আমাদের আলোচনা শোন্। চুপ করে বোস্।' শাস্ত্রীমশায়ের এই কথা শুনে আমি কিন্তু স্থির করলাম ঐ জায়গা থেকে সরে পড়া। ওঁরা যে-রকম ভাবে গো-হত্যা সম্বন্ধে নানারকম সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণ করে আলোচনা করছিলেন তাতে আমার মনে হচ্ছিল আমাকেই হত্যা করা হচ্ছে। আমি ভাবছিলাম— এক সময় হিন্দুরা গোরু খেত, সে তো খেতই, সেও এক সত্য আর এখন খায় না এও এক সত্য। এ নিয়ে এত তর্ক-বিচার কেন! আগে খেত, এখন খায় না, এই তো ঝঞ্ঝাট চুকে গেল। যখন ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি বড়োবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আজ সন্ধের সময় উধাও হোয়ো না, ঠিক সময় এসো, তখন তোমাকে তাই-ই দেব যা তোমার রুচবে।'

সেদিন বিকেল বেলা ঠিক সময় বড়োবাবুর কাছে উপস্থিত হলাম। তখন তাঁর সান্ধ্যভোজনের সময়। তিনি খেতেন সন্ধের সময় গরম গরম ফুলকো লুচি; তিন-চার রকম তরিতরকারি আর পুডিং। পুডিং ছাড়া বাকি সব ভোজ্য জিনিসই একটি পাথরের থালায় সাজিয়ে দেওয়া হত। যে পদগুলি বাটিতে দেবার মতন সেগুলি পাথর বাটিতে সাজিয়ে দেওয়া হত। কেবল পুডিংটি পুডিং তৈরি করার পাত্রেই থালার পাশেই থাকত। খাবার ব্যাপারে, টেবিল-চেয়ারে বসে খেলেও সাহেবিয়ানা ছিল না। ছুরি-কাঁটার বালাই ছিল না, হাত দিয়েই খেতেন। পুডিংটি অবিশ্যি একটি চামচ দিয়ে খেতেন। যখন লুচি দিয়ে কোনো পদ খেতেন তখনো তার মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছিলাম। একটা পদ সম্পূর্ণ শেষ না করে আর-একটা পদ দিয়ে লুচি খেতেন। ধরা যাক— তাঁর পাতে বেগুন ভাজা আছে, কুমড়োর ছোঁকা আছে, হয়তো বাঁধাকপির ছোঁকাও আছে, তিনি লুচি দিয়ে একবার একটু কুমড়োর ছোঁকা খেলেন, তার পর হয়তো একটু বেগুন ভাজা খেলেন, তার পর একটু বাঁধাকপির ছোঁকা খেললেন, আবার একটুখানি কুমড়োর ছোঁকা দিয়ে লুচি খেলেন, আবার বাঁধাকপি

দিয়ে খেলেন। এইরকম করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মুখ বদল করতেন। তাঁর খাবার এইরকম রীতি দেখে আমি তাঁকে একদিন বললাম, 'আমরা তো একটা পদ শেষ করে অন্য পদ ধরি। একবার একটু এ-পদ খেলাম আর একবার একটু ওই পদ খেলাম এইভাবে তো আমরা খাই না।' আমার কথা শুনে তিনি বললেন, 'এই দেখ-না তিন-চার পদই খাচ্ছি, কিন্তু প্রত্যেকবারই কেমন একটু আস্বাদ বদল হয়ে যাচ্ছে। তাই আস্বাদের একঘেঁয়েমি বোধ হয় না। কুমড়োর ছোঁকা একটু খেলাম তার স্বাদও বেশ আলাদা লাগল, তার পর একটু বেগুন ভাজা খেলাম—তার স্বাদ একটু ভিন্ন লাগল আবার যখন ঘুরে একটু কুমড়োর ছোঁকা খেলাম বেশ ভালো লাগল। এত অল্প সময়ের মধ্যে তিন-চার পদ একটু একটু করে তিন-চার বার খাওয়া হল, স্বাদও বদল হল। তুমি এরকম করে খেয়ে দেখো, কি রকম লাগে আমাকে বোলো।' সন্ধের সময় সেদিন খাওয়াদাওয়া ভালোই হল। একবার মনে হয়েছিল সকালবেলা শাস্ত্রীমশায় ও তাঁর আলোচনাকে কেন্দ্র করে আমার মনে যে প্রশ্ন জেগেছিল সেই প্রসঙ্গ তুলি, কিন্তু সে প্রসঙ্গ তোলা হল না, কারণ তখন নিচুবাংলার অন্দরমহল থেকে একজন কাকে দিয়ে বড়োমা আমাকে তলব করেছিলেন। বড়োমার কাছে উপস্থিত হতেই বড়োমা আমাকে বললেন, 'দেখ সুধাকান্ত, তুমি যেদিন যেদিন বাবামশায়ের সঙ্গে খাবে বেশ আগের থেকে আমাকে একটু জানিয়ে দিয়ো, তা হলে এই খাবার কম পড়া নিয়ে বাবামশায়কে অনর্থক বিরক্ত হয়ে হৈ-চৈ করতে হবে না। আমি তাঁর খাবার মতোই যা যা করবার করে পাঠাই, সেটা তো ঠিক দু-জনের মতো নয়, তিনি যতটা খান সেই পরিমাণেই পাঠাই।' বড়োমার কথা শুনে আমি বললাম, 'তাই করব। কিন্তু আমিই বা কিরকম করে আগের থেকে জানব কোনদিন সকালে কিংবা বিকেলে তিনি আমাকে ডেকে পাঠাবেন আর বলবেন, 'বসো, আমার সঙ্গে খাও।' আমার কথা শুনে বড়োমা বললেন, 'তোমার কথাও তো ঠিক।

বাবামশায় তোমাকে ডেকে পাঠালে যদি সম্ভব হয় আগে আমাকে খবর দিয়ো।'

সেদিন বড়োমার এ-সব কথা বলার বিশেষ কারণ ছিল। বোধহয় সেই দিনের দু-তিন দিন আগে বড়োবাবুর সঙ্গে সন্ধেবেলায় খাবার সময় বড়োবাবু তো প্রথমেই ওঁর পাতের থেকে গোটা দুই-তিনেক লুচি আমার পাতে তুলে দিলেন। তার পর যখন দ্বিতীয় দফায় লুচি এল, এল ঠিক নিয়ম মতন সেই সংখ্যাতেই সাধারণতঃ বড়োবাবু যে ক'টি লুচি খেতেন— হয়তো দু-একটি বেশিও এল। তার থেকে আমাকে চার-পাঁচখানা দিলে বড়োবাবুর ভাগে আর কিছুই থাকে না। এই দেখে বড়োবাবু তাঁর স্বভাবসুলভ তাৎক্ষণিক বিরক্তি প্রকাশ করে হৈ-চৈ করে উঠলেন। কাছেই ছিল মুনীশ্বর, তাকে ডেকে বললেন, 'ব্যাপার কি? আমি কি আজ নতুন খাচ্ছি! আমি কটা লুচি খাই, কতটা কি খাই বৌমা কি জানেন না? এই নতুন ব্যবস্থা কে করলে?' ইত্যাদি।

মুনীশ্বর ছিল বড়োবাবুর একান্ত ভক্ত ভৃত্য। একান্ত ভক্ত ভৃত্য বললে যথেষ্ট বলা হয় না— মুনীশ্বর ছিল তাঁর তত্ত্বাবধায়ক, পার্শ্বচর, সর্বক্ষণের সঙ্গী। এইজন্য মুনীশ্বর বড়োবাবুরই কাজেকর্মে কিংবা কোনো অনিবার্য কারণে কিছুক্ষণ অনুপস্থিত থাকলে তাঁর পক্ষে সেটা বড়োই অসুবিধার কারণ হত। চব্বিশ ঘণ্টা বড়োবাবুর কাছে থাকার জন্যে মুনীশ্বরও তাঁর ধাত, স্বভাব, মেজাজ এমনভাবে বুঝে নিয়েছিল যে বড়োবাবু ইঙ্গিতে যা বলতেন মুনীশ্বর ষোলো-আনা তা বুঝে নিত। বড়োবাবুর অভাব-অভিযোগের ফাই-ফরমাশের তাল সামলাবার জীবন্ত যন্ত্রস্বরূপ ছিল মুনীশ্বর। বড়োবাবু ছিলেন একদিকে যেমন মহাপণ্ডিত, আর-একদিকে ছিলেন এমন ভোলানাথ যার জুড়ি সহজে মেলে না। বড়োবাবুর স্বভাব-বৈচিত্র্য কেমন ছিল বলি: একবার বড়োবাবু তন্ময় হয়ে কী একটা বিষয় লিখছিলেন, লিখতে লিখতে কয়েকমিনিট বিরাম নেবার জন্যে কিংবা লেখ্য বিষয়ের একটা-কিছু নিয়ে চিন্তা করবার জন্যে নাকের



মুনীশ্বর — শিল্পী শ্রীমুকুলচন্দ্র দে

থেকে তাঁর চশমাটি কপালে তুলে হাত গুটিয়ে চুপ করে বসেছিলেন, কিছুক্ষণ পরেই আবার লিখবার জন্যে কলম ধরলেন, কিন্তু খেয়াল ছিল না যে চশমাটা নাকের উপরে নেই, আছে কপালে তোলা। চশমা নেই বুঝতে পেরে 'বড়ো মুশকিলেই পড়েছি, আমার চশমা কোথায় গেল', এই বলে বেশ একটা হৈ-চৈ বাধিয়ে দিলেন। কাছেই ছিল বাগানের মালী গোষ্ঠ— সে দৌড়ে এসে বড়োবাবুকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি চাই হুজুর ?' উত্তরে বড়োবাবু বেশ চড়া গলায় বললেন, 'হুজুর দিয়ে কি হবে, আমার চশমা খুঁজে পাচ্ছি না।' গোষ্ঠ দেখতে পেয়েছিল যে চশমা জোড়াটি বড়োবাবুর কপালে আছে। সে যতই চেষ্টা করছিল ঐ কথা বড়োবাবুকে বলতে, বড়োবাবু ততই রেগে যাচ্ছিলেন, কিছুতেই গোষ্ঠকে তার বক্তব্য বলবার সুযোগ দিচ্ছিলেন না। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর হৈ-চৈ শুনে মুনীশ্বর তার বাড়ি থেকে দৌড়ে এসে বড়োবাবুর ঘরে ঢুকেই কোনো কথাবার্তা না ব'লে বড়োবাবুর চেয়ারের পেছনে গিয়ে চট্ করে দু-হাত দিয়ে আস্তে আস্তে চশমাটি বড়োবাবুর নাকে পরিয়ে দিলে। অমনি বড়োবাবুর রাগের আগুনে জল পড়ল। তখন তিনি গোষ্ঠকে বললেন, 'এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট না করে বললেই পারতে চশমাটা কোথায় আছে। তুমি তো দেখতেই পাচ্ছিলে চশমা কোথায় আছে। যাও, নিজের কাজ করো গিয়ে।' সব ঝড় থেমে গেল। বড়োবাবু আবার লিখতে শুরু করলেন। আর একটি ঘটনা, যখন তাঁর বার্ধক্যের কথা বিবেচনা করে স্থির করা হল যে তাঁর অন্তে বিষয়সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা কেমন হবে, টাকাকড়ি কে কি পাবে ইত্যাদি বিষয় একটা পাকাপোক্ত উইল তাঁকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া দরকার। এই উইলের একটা খসড়া তৈরি করে একজন উকিল বা ব্যারিস্টার সুরেন ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। তিনি এই ধারণা নিয়ে এসেছিলেন যে বিষয়সম্পত্তি সম্বন্ধে নিরাসক্ত, বৈষয়িকতা সম্বন্ধে উদাসীন বড়োবাবুকে, উইলের খসড়ার বিষয়বস্তু বোঝাতে গেলে বড়োবাবু ঠিক সেগুলো বুঝতে

পারবেন না, বিরক্ত হবেন। কিন্তু যখন তিনি আর সুরেনবাবু, হয়তো সেইসঙ্গে দ্বিপুবাবুও ছিলেন— উইলের খসড়া পড়ে শোনাতে আরম্ভ করলেন, বড়োবাবু খসড়ায় যা-কিছু লেখা ছিল মনোযোগ দিয়ে শুনলেন, তার পরেই বললেন, 'এ ঠিক হয় নি, এর মধ্যে অনেক কিছু বাদ পড়ে গেছে, এগুলো না সংশোধন করলে পরে এই উইল নিয়ে অনেকের অনেক অসুবিধা হতে পারে।' এই বলে তিনি এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে ঐ উইলের খসড়ার বিচার আরম্ভ করলেন, যা শুনে উকিলবাবু বিস্মিত হলেন। তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি যে বড়োবাবু অত বিচক্ষণতার সঙ্গে উইলের ত্রুটি আবিষ্কার করবেন এবং সেই ত্রুটির প্রতিকার কিরকম করে করা হবে তার যৌক্তিক নির্দেশ দেবেন। বড়োবাবু গম্ভীরভাবে শেষ যে মন্তব্য করেছিলেন তার সারমর্ম হচ্ছে— তাঁর সেক্রেটারি অনিল মিত্রের, গোষ্ঠর, মুনীশ্বরের সম্বন্ধে এই উইলে যা করণীয় তার উল্লেখ অত্যন্ত ঝাপসা। এই ঝাপসা-ভাবের ব্যাখ্যা এঁদের স্বার্থের অনুকূল না হয়ে প্রতিকূল হতে পারে, সুতরাং এ বিষয় পরিষ্কারভাবে এমন নির্দেশ থাকা প্রয়োজন যা নিয়ে ব্যাখ্যার কোনো সুযোগ থাকবে না। বলা বাহুল্য উইলটি যখন সংশোধন করে তাঁর কাছে উপস্থিত করা হ'ল তখন তিনি তা স্বাক্ষর করলেন, তার পূর্বে স্বাক্ষর করেন নি।

অবৈষয়িক যে তিনি কেমন ছিলেন তার একটা বিষয় রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলি। একদিন শাস্ত্রীমশায়ের সঙ্গে বড়োবাবুর বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'দেখুন শাস্ত্রীমশায়, বড়দা কেমন বৈষয়িক শুনুন— আপনি তো জানেন বড়দার কোনো লেখা কোনো কাগজে প্রকাশের জন্যে পাঠালে তার প্রুফ তিনি আগাগোড়া সংশোধন করতেন। কলকাতা থেকে ডাকযোগে প্রুফ আসতে, ডাকযোগে সেই প্রুফ সংশোধন করে ফেরত পাঠাতে, আবার সেই প্রুফ পুনরায় সংশোধনের জন্যে বড়দার কাছে পাঠাতে যে সময় লাগে সেই সময়টা বড়দার কাছে মনে হত দীর্ঘ সময়। বড়দা অধৈর্য হয়ে পড়েন যতক্ষণ পর্যন্ত প্রুফ নির্ভুল-

ভাবে সংশোধিত হয়ে প্রেসে না যায়। এইরকম অবস্থায় একবার পড়ে অর্থাৎ প্রুফ আসতে-যেতে দেরি হয় দেখে বড়দা স্থির করলেন কলকাতা থেকে বড়োবাবুর এস্টেটের কলকাতার সদর অপিসের প্রধান কর্মচারী কুঞ্জ প্রুফ নিয়ে আসবে, সকালের ট্রেনে আসবে, প্রুফ সংশোধন করিয়ে নিয়ে তার পরদিনই কিংবা সেইদিনই কোনো ট্রেনে কলকাতা ফিরে যাবে। যেমন ইচ্ছে তেমনি ব্যবস্থা হল। কুঞ্জ প্রুফ নিয়ে যাওয়া-আসা শুরু করলে। কয়েকবার যাওয়া-আসা করতেই হঠাৎ বড়দার বৈষয়িক ভাবনা মাথায় এল। আমার কাছে এসে বললেন, 'দেখো রবি, এই ব্যবস্থা ভালো হয় নি, কুঞ্জ কেবলই আসছে আর যাচ্ছে, কলকাতা থেকে বার বার এমন করে আসা-যাওয়ায় মনে হচ্ছে খরচ বেশ হচ্ছে। এরকম খরচও না হয় আর প্রুফ দেখার কাজও ভালো করে হয় তার একটা উপায় ভেবেছি। আমি বলি তুমি আর আমি কলকাতায় একসঙ্গে যাই, সেখানে গিয়ে কয়েকদিন থাকলে প্রুফ দেখার কাজ ভালোভাবেই হবে। সকালে বিকেলে প্রুফ দেখব, এইরকম করলে কয়েকদিনের মধ্যেই প্রুফ দেখার কাজ শেষ হয়ে যাবে, তার পর আমরা দু-জনে চলে আসব।' আমি বড়দার কথায় মনে মনে হেসে সায় দিয়ে বললাম, এ হলে তো ভালোই হয় কিন্তু মুনীশ্বর, অনিল আর সব প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে কলকাতায় যাওয়া, সেখানে কয়েকদিন থাকা, আবার এই-সব নিয়ে ফিরে আসা, সেও তো কম খরচের কথা নয়। আমার কথা শুনে বড়দা বললেন—'রবি তুমি বুঝতে পারলে না, আমি আর তুমি একবার যাব, একবার আসব। আর এদের সব একসঙ্গেই নিয়ে যাব, আবার এরা আমাদের সঙ্গেই চলে আসবে এই তো। একবার যাওয়া আর আসা। এর তুলনায় কুঞ্জর বারবার আসা-যাওয়া কত খরচ, কেবল আসছে আর যাচ্ছে।' বড়দার কথা শুনে আমি বললাম, আচ্ছা, আমি ভেবে দেখি কোন্ তারিখে গেলে সুবিধে হবে। আমার কথা শুনে বড়দা মহাখুশি হয়ে নিচুবাংলায় ফিরে গেলেন। আমি আর কালবিলম্ব না করে

দ্বিপুর কাছে গিয়ে সব কথা বললাম। দ্বিপু বড়দাকে এ-সব বিষয় হতে নিরস্ত করবার বেশ কৌশল জানে। আচ্ছা, শাস্ত্রীমশায় একবার ভেবে দেখুন দেখি আমি যাব, আমার ভৃত্যটি যাবে, বড়দা যাবেন, তাঁর দু-জন অনুচর যাবে আর সঙ্গে যাবে বড়দার লেখবার কাগজপত্র নিত্য প্রতিক্ষণের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। অন্যেরা নাহয় থার্ড ক্লাস কিংবা ইণ্টার ক্লাসেই গেল, বড়দাকে নিয়ে যেতে হলে তো একটা ফার্স্ট ক্লাস কুপে রিজার্ভ করেই যেতে হবে, ফিরে আসতে হবে ঐরকম করেই। তার পর তো কলকাতায় যে কদিন থাকা হবে সেখানেও বেশ খরচা আছে। এ-সব কথা বড়দা মোটেই চিন্তা করে দেখেন নি, উনি কেবল ভাবছেন প্রুফ দেখার পর্ব কিসে চট্‌পট্ করে শেষ হয়। শাস্ত্রীমশায়, আপনি ভেবে দেখুন বড়দাকে যদি নিয়ে যাওয়া যায় তা হলে কলকাতায় গিয়ে আমারই বা কি অবস্থা হবে আর বড়দারই বা কি অবস্থা হবে, গেলেই তার পরদিন কলকাতা থেকে দু-জনকে ফিরে আসতে হবে। দ্বিপু যখন তাঁকে সব কথা বুঝিয়ে বললে বড়দা বুঝলেন। তার পর আমার সঙ্গে যেদিন দেখা— বললেন, 'দেখো রবি, আমি বড়োই আন্‌প্র্যাক্‌টিক্যাল। তোমাকে যে প্রস্তাব করেছিলাম কলকাতা যাবার, সে অনুযায়ী কাজ করলে কত অসুবিধেতে যে পড়তাম তা ভেবেও দেখি নি। তুমি তো কিছুই বললে না, কেবল লটবহর নিয়ে যাওয়া-আসার কথাটাই বলছিলে। দ্বিপু কিন্তু আমাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন যে যাওয়া-আসায়, কলকাতায় থাকায় কত অসুবিধে আর খরচও কত বেশি।' এই বলে বড়দা খুব একচোট অট্টহাসি হেসে নিজের আস্তানায় ফিরলেন। বড়দার বৈষয়িক বিচার-বিবেচনার ঘটনাগুলি বলতে হলে একটি মস্ত ফর্দ তৈরি হয়। বড়দার জমিদারি পরিচালনার ব্যাপার শুনুন, সংক্ষেপেই বলি— বাবামশায়ের আদেশ-ক্রমে বড়দা তো গেলেন জমিদারির কাজকর্ম কিরকম হয়, জমিদারি পরিচালনার কাজই বা কিরকম হয় তাই দেখতে। গিয়ে আর বেশি দিন সেখানে থাকতে হয় নি,

কিছুদিন পরেই তাঁকে ফিরে আসতে হল। শুনেছি সেখানে গিয়ে তাঁর প্রথম এবং প্রধান কাজ হল, সকালে বিকেলে প্রজাদের বাড়ি গিয়ে গিয়ে খোঁজ নেওয়া কার কিরকম অবস্থা, কার খাজনা বাকি পড়েছে, কেন বাকি পড়েছে ইত্যাদি। দ্বিতীয় কাজ হল জমিদারির কর্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রজাদের নালিশ, অভিযোগ সংগ্রহ করা। তৃতীয় কাজ হল প্রজাদের কাছে এক-তরফা নালিশ-অভিযোগের কথা শুনে তদনুযায়ী এস্টেটের কর্মচারীদের কাছে কৈফিয়ত চাওয়া, তাদের ধমক দেওয়া। এস্টেটের কর্মচারীরা তাঁর কাছে, প্রজাদের কাছ থেকে অনাদায়ী খাজনার হিসেবের আর আদায়ী খাজনার হিসেবের এবং নানাবিধ খরচ খরচার হিসেবের খাতাপত্র নিয়ে দেখাতে গেলে প্রথমেই তো তাদের ধমক দিয়ে বলতেন, 'তোমরা তো নিজেদের রীতি অনুসারে যা লেখবার তাই লিখে এনেছ, ও তো বাঁধাধরা গৎ। অত হিসেব নিকেশ আমার দেখবার দরকার নেই। যে-যে প্রজা খাজনা দেয় নি, কেন দেয় নি তাই বলো, তাঁদের আমার কাছে ডেকে আনো। আমি তাদের কাছে শুনতে চাই, তোমাদের মোকাবিলায় তাদের কথা।' বড়দার এই কর্মনীতির ফল হল কর্মচারীদের এবং প্রজাদের উভয় পক্ষের ত্রাসের কারণ। প্রজারা এই ভেবে ভীত হল যে জমিদারবাবু তো আজ এসেছেন কাল চলে যাবেন। আমাদের থাকতে হবে তো জমিদারির কর্মচারীদের হাতেই। জমিদারবাবুর কাছে কর্মচারীদের বিরুদ্ধে তাদের সামনে কিছু বললেও বিপদ, আর জমিদার মনিবের কাছে সত্যিকথা না বললেও জমিদার অসন্তুষ্ট হবেন। পক্ষান্তরে এস্টেটের কর্মচারীরা বিব্রত হলেন এই ভেবে যে প্রজাদের কথা শুনে বড়দা তাঁদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন। যে কদিন বড়দা জমিদারিতে ছিলেন তার পরিণাম প্রজাদের অধিকাংশের পক্ষে হল শুভ আর এস্টেটের কর্মচারীদের মানমর্যাদাও প্রজাদের কাছে গেল কমে। এক কথায় প্রজারা যা চেয়েছিল বড়দা তাদের অনুকূলে দিলেন রায়, অর্থাৎ অধিকাংশ গরিব প্রজার অনাদায়ী খাজনা হয়ে গেল মাফ। তাদের অনাদায়ী

খাজনার জন্য তাদের যে-সব জমি জমিদারি নিয়মে খাস করা হয়েছিল তাদের সেই-সব জমি অনেককে বিনা সেলামীতে দিয়ে দেবার আদেশ দেওয়া হল। শুধু এই-ই নয়, অনেক গরিব প্রজাকে দান খয়রাতি স্বরূপ বেশ কিছু টাকা দেওয়ারও আদেশ দিলেন। বড়দার এই মনোভাবের সুযোগ নিয়ে এমন অনেক প্রজা যারা গরিব নয়, স্বচ্ছল বললেও চলে, তারাও বাকি খাজনা না দেবার চেষ্টা করেছিল। এই নীতিতে জমিদারির পরিচালনা করলে শেষ পর্যন্ত জমিদারির অবস্থা যে কী হবে সেই কথাটা দু-একজন কর্মচারী সাহস করে বড়দাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় নি। ব্যর্থ হয় নি এই হিসেবে যে বড়দা বুঝতে পারলেন যে তাঁর পক্ষে জমিদারি পরিচালনা, জমিদারের ষোলো-আনা স্বার্থ রক্ষা করা আর প্রজাদেরও সব অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করা সম্ভব নয়। তাই তিনি জমিদারি দেখার দায়িত্ব ছেড়ে কলকাতায় ফিরে এলেন। বাবামশায়ের কাছে এ-সব খবর আগেই পৌঁচেছিল। তবুও বাবামশায় এস্টেটের তৎকালীন প্রধান কর্মচারীকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন যে বড়দা যে-সমস্ত আদেশ পালন করবার জন্যে তাঁকে আদেশ দিয়েছিলেন তা যেন অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করা হয়, অর্থাৎ যাদের বাকি খাজনা মাফ করবার আদেশ দিয়েছেন, যাদের খাস করা জমি পুনরায় বিনা সেলামীতে ফিরিয়ে দিতে বলেছেন, যাদের যে পরিমাণ অর্থ সাহায্য করতে বলেছিলেন সেগুলো যেন সম্পূর্ণরূপে পালন করা হয়।'

বড়োবাবুর পশুপক্ষীর প্রতি যে আন্তরিক কী পরিমাণ ভালোবাসার ভাব ছিল তার কিছু আভাস পূর্বেই দিয়েছি। এ সম্বন্ধে দু-একটি ঘটনার কথা বলি— একদিন ওঁর ঘরে গিয়ে দেখলাম তিনি তাঁর চেয়ারে বসে আরাম করে লম্বা সটকায় তামাক টানছেন, 'অম্বুরি' তামাকের সুগন্ধে ঘরের হাওয়া ভরপুর। কপালের উপর চশমা জোড়া তুলে রেখেছেন, একটা চোখে সামান্য তুলো দিয়ে একটা পটি বাঁধা। আমি কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে পাশের

মোড়ায় বসলাম। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বলো আজকের খবর কি?' তাঁর প্রশ্নের উত্তরে আমি বললাম, 'আশ্রমের খবর বলবার আগে আপনার খবর নিই।' আমার কথা শুনে তিনি বললেন, 'আমার আবার খবর কী!' আমি বললাম, 'আপনি চোখে পটি বেঁধেছেন, আপনার চোখে কি হয়েছে?' আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলে চললেন, 'আর বল কেন, এই ছোটো ছোটো পাখিগুলোর দৌরাত্ম্য বড়োই বেড়ে গেছে। একটা পাখি মাথার উপর বসেছিল, হঠাৎ তার কি খেয়াল হল আমার চোখে ঠোঁট দিয়ে একটা খোঁচা দিয়ে দেখলে ওখানে কিছু খাদ্য পাওয়া যায় কিনা। ছাতু দিই, বিস্কুটের টুকরো দিই তাতে ওর মন ওঠে না। ভাগ্যিস বেশি জোরে ঠোকর দেয় নি তাই রক্ষে, জোরে ঠোকরালেই চোখটা গিয়েছিল আর কি। লোশন টোশন দিয়ে তো চোখটা ধুয়ে ফেলে এই পটি বেঁধেছি। বেশি কিছু জখম করতে পারে নি। এখন আর জ্বালা যন্ত্রণা নেই। এই পাখিগুলো বড়ো আশকারা পেয়ে গেছে, এদের শায়েস্তা করতে হবে, এদের আর ঘরে ঢুকতে দেব না।' এই বলে খুব একচোট অট্টহাসি হেসে বললেন, 'তুমি কি ভেবেছ আমি আসতে দেব না বললেই ওরা আসা বন্ধ করবে। দরজা তো খোলাই থাকে, কোন ফাঁকে এসে ঢুকে পড়বে তার ঠিক নেই, সব সময় কি আর সতর্ক হয়ে থাকা যায়। যাক, ওদের আর মাথায় বসতে দেব না।' তাঁর কথা শেষ হতেই আমি বললাম— 'তা হলে তো দেখছি আপনার লেখাপড়ার কাজ এখন দু-একদিন বন্ধ থাকবে।' তিনি বললেন, "লেখাপড়ার কাজ কেন বন্ধ থাকবে, দুটো চোখে তো আর ঠোকরায় নি। একটা চোখেই বেশ কাজ চলবে।' তার পর তাঁকে আশ্রমের দু-একটা খুঁটিনাটি খবর, যেমন ফুটবল খেলায় আগের দিন ছেলেরা জিতেছিল প্রতিপক্ষকে হারিয়ে, আমাদের লাঠি খেলার গল্প, দল বেঁধে বৃষ্টিতে ভিজে আসার গল্প বললাম। বড়োবাবু এইরকমের আশ্রমের ছোটো বড়ো খবর শুনতে ভালোবাসতেন। খবর যে কেবল

আমার কাছেই শুনতেন তা নয়, অ্যাণ্ড্রুজ সাহেব, পিয়ার্সন সাহেব—এঁরাও গিয়ে তাঁর কাছে নানা রকমের গল্প করতেন। সে-সব গল্প কিন্তু খেলাধুলার গল্প নয়। সংবাদপত্রে প্রকাশিত নানা রকমের আলোচ্য সংবাদ নিয়ে গল্প। সেই-সব গল্পের মধ্যে যে-সব সংবাদ তাঁর মনকে পীড়া দিত তা শুনে দুঃখ প্রকাশ করতেন, উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। আবার সঙ্গে সঙ্গেই কোনো মজার খবর শুনলে অমনি খুব একচোট অট্টহাসি হাসতেন। পীড়াদায়ক সংবাদ শুনলে বড়োবাবু তখনকার মতো ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন জেনে অ্যাণ্ড্রুজ সাহেব ঐ-সব খবর কতকটা চেপে যেতেন; চেপে গেলেও হবে কি! কিছু কিছু খবর তো বলতেই হত, যেমন কোথায় ট্রেন সংঘর্ষে কত লোক জখম হয়েছে, কোথায় স্ট্রাইকারদের উপরে অযথা গুলি চালানো হয়েছে সরকারি পক্ষ থেকে, কোথায় কি নিয়ে স্ট্রাইক হয়েছে, ইত্যাদি। এইরকমের খবর বড়োবাবুকে না জানাবারও উপায় ছিল না অ্যাণ্ড্রুজ সাহেবের, কারণ খবরের কাগজে কি খবর বেরচ্ছে সে সংবাদ ইচ্ছায় অনিচ্ছায় আরো দু-একজন তাঁকে দিতেন, যেমন তাঁর সেক্রেটারি অনিল মিত্র, পিয়ার্সন সাহেব, আর কখনো কখনো আমিও। অ্যাণ্ড্রুজ সাহেবের অনেক কাজের মধ্যে একটা কাজ ছিল সংবাদপত্রে দুনিয়ার হালচালের খবর যা বেরত তাই বড়োবাবুকে বলা এবং তাই নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা।

পাখির চোখ ঠোকরানোর কথা তো পূর্বেই বলেছি। আর-একটা ঘটনা বলি—যেমন যেতাম তেমনি একদিন তাঁর ঘরের কাছে উপস্থিত হতেই শুনলাম তিনি মুনীশ্বরকে বলছেন: 'দেখো আস্তে আস্তে বের করো, জোরে হাত দিয়ে চেপে বের করতে গিয়ে ওটাকে আবার মেরে ফেলো না।' এই-সব শুনে সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকে গিয়ে দেখি, মুনীশ্বর তাঁর জোব্বার হাতার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে ভিতর থেকে একটা ছোটো কাঠবিড়াল আস্তে আস্তে টেনে বের করছে। কাঠবিড়ালটা তার প্রাপ্য বিস্কুট কিংবা কিছু খেয়ে

বড়োবাবুর ঘাড়ে পিঠে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে কোন্ ফাঁকে জামার হাতার ভিতরে ঢুকে পড়েছিল। ঢোকবার সময় বোধ হয় সহজেই ঢুকে পড়েছিল, কিন্তু বেরিয়ে আসবার পথ ঠিক খুঁজে পাচ্ছিল না ; বড়োবাবু তাকে নিজে বের করতে না পেরে মুনীশ্বরের সাহায্য নিলেন। মুনীশ্বর কাঠবিড়ালটাকে জামার ভিতর থেকে বের করতেই সেটাকে মুনীশ্বরের হাত থেকে নিয়ে নিজের কোলের উপর বসিয়ে তার গায়ে পিঠে হাত বোলাতে লাগলেন। ঐ দেখে আমি বললাম, 'এইজন্যেই তো আপনার এই দুর্ভোগ। এত ভালোবাসেন বলেই এরা আপনার উপর এত অত্যাচার করে।' আমার কথা শুনে তিনি বললেন, 'অত্যাচার করে না, অত্যাচার করে না, এরা খেলা করে। নিশ্চয়ই তোমার মতো কোনো দুর্জন হয়তো বাইরে থেকে আমার ঘরে উঁকিঝুঁকি মেরেছিল তাই ভয় পেয়ে বেচারা লুকিয়ে পড়বার জন্যে জামার ভিতর ঢুকে পড়েছিল। ও তো প্রায়ই এসে আমার গায়ের উপর ওঠে, খেলাটেলা করে আবার চলে যায়।' শুধু গায়ে পিঠে তার হাত বুলিয়ে তিনি ক্ষান্ত হতে চান নি, একটুকরো বিস্কুটও তাকে দেবার মতলবে ছিলেন, কিন্তু সে আমাকে দেখে বড়োবাবুর হাত ফস্‌কে বাইরে কোথায় পালিয়ে গেল। মুনীশ্বর বড়োবাবুর চব্বিশ ঘণ্টার সাথী ছিল বলেই মুনীশ্বরকে এই-সব কাঠবিড়াল, পাখি, ভয় করত না, কিন্তু আমাদের দেখলেই পালিয়ে যেত।

এক সময় শান্তিনিকেতন আশ্রমে দুটি হরিণ আর এক জোড়া ময়ুর সংগ্রহ করা হয়েছিল। ময়ুর দুটিকে সেই সময়কার ছাত্রাবাস বাগান-বাড়ির দক্ষিণ দিকে একটি আমগাছের তলায় খুব বড়ো তারের জাল দিয়ে তৈরি ঘেরার মধ্যে রাখা হত। হরিণ দুটি কিছুদিন পর্যন্ত স্বাধীনভাবে আশ্রমেই ঘোরাফেরা করত। কিন্তু তাদের সে স্বাধীনতা বেশিদিন বজায় থাকে নি ; বজায় না থাকবার কারণ আশ্রমের বেওয়ারিশ কুকুরগুলো তাদের তাড়া করত, এই তাড়ার জুলুমে একটি হরিণ তো একদিন আশ্রম থেকে দৌড়ে

পালিয়ে কোথায় যে চলে গেল তার খোঁজ পাওয়া গেল না। কয়েকদিন পরে খবর পাওয়া গেল যে দূরে এক সাঁওতাল পল্লীতে সাঁওতালদের তীরের আঘাতে তার মৃত্যু ঘটেছে। রইল বাকি একটি হরিণ। তার যথেচ্ছভাবে আশ্রমে বিচরণ করবার স্বাধীনতা ঘুচেছিল তার নিজের দোষে। যখন তার শিঙ একটু বড়ো হতে লাগল তার স্বভাবের পরিবর্তন ঘটল। সে তখন যাকে সামনে পায় তাকেই গুঁতোতে যায়। দু-একজন তার গুঁতো অল্পবিস্তর খেয়েও ছিল। ক্রমশ সে যেমন বড়ো হতে লাগল মানুষকে গুঁতোবার উৎসাহও তার বেড়ে চলল। সে সকলের কাছে একটা আতঙ্কের জীব হয়ে উঠল। এই হরিণ সম্বন্ধে একটা ঘটনার কথা বলি— ঘটনাটি আমি প্রত্যক্ষ করি নি, প্রত্যক্ষ করেছিলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু শান্তিনিকেতন আশ্রম-বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীনরেন্দ্রনাথ নন্দী। ঘটনার বিবরণ তাঁর লিখিত চিঠির ভাষাতেই বলি— 'সেই হরিণ মনে আছে? শিং গজাতে আরম্ভ করেছে, তার উগ্রতায় তখন সকলেই তটস্থ। তার গলায় দড়ি বেঁধে দু-দিকে দু-জনে ধরে নিয়ে তখন তাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসত, কখন কাকে যে গুঁতিয়ে দেবে সেই ভয়ে। একবার সে আশ্রমে হলঘরের (পরে প্রাক্-কুটির) উত্তরে ক্ষীরকুল গাছে দড়ি দিয়ে সকালে বাঁধা ছিল। বড়োবাবু রোজ হেঁটে আশ্রম প্রদক্ষিণ করতেন। সেদিন হঠাৎ বেড়াতে বেড়াতে তাঁর দৃষ্টি হরিণের উপর পড়ল, তিনি হরিণের দিকে আসতে লাগলেন। ছেলেরা যারা তাঁকে দেখল হরিণের দিকে আসতে তারা তো ভয়ে অস্থির, যদি হরিণ সেই বৃদ্ধকে গুঁতিয়ে দেয় তবেই তো সব শেষ। কিন্তু বৃদ্ধকে নিষেধ করবার সাহসও কারো হল না। বড়োবাবু নিশ্চিন্ত মনে হরিণের দিকে এগিয়ে গিয়ে তার গায়ে হাত বোলাতে লাগলেন। আশ্চর্য! সেই দুর্দান্ত হরিণ শান্তভাবেই দাঁড়িয়ে রইল, কিছুমাত্র নড়াচড়া করল না। বড়োবাবু হরিণের গায়ে হাত বুলিয়ে চলে গেলেন। ছেলেরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সেদিন বুঝলাম কথায় যে আছে— যাঁরা ভয়হীন,

হিংসাহীন, হিংস্র জন্তুরাও তাঁদের কিছু করে না, এ কথার কথা নয়, একেবারে চোখে দেখা। এ ঘটনা ভুলতে পারি না। বড়োবাবু যে কত বড়ো তা যেন চোখে আঙুল দিয়ে এই ঘটনা বলে দিল। তখনই বুঝলাম সেই যে শালিক ছুটো বড়োবাবুর, তারাও কেমন নির্ভীক হয়েছিল, যখন-তখন ঘাড়ে মাথায় এসে বসত— এমন-কি ছেলেদের সেই খাবার-ঘরের খাবার লাইনের মধ্যে দিয়েও নিশ্চিন্ত মনে হেঁটে বেড়াত।'

যেমন মাঝে মাঝে বড়োবাবুর কাছে যেতাম, তেমনি একদিন সকালে তাঁর কাছে উপস্থিত হতেই তিনি বললেন, 'তোমরা অমন শান্ত হরিণটিকে গলায় দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে কেন কষ্ট দাও। ও স্বাধীনভাবে আশ্রমে ঘুরে বেড়াক এটা কি তোমাদের সহ্য হয় না! রবি (রবীন্দ্রনাথ) কি এই কাণ্ড দেখেছেন! তিনি যদি দেখেন হরিণকে তোমরা বেঁধে কষ্ট দিচ্ছ হরিণ পোষার শখ মেটাবার জন্যে, তা হলে মজা টের পাবে। রবি এ-সব মোটেই পছন্দ করেন না। এ হচ্ছে নিষ্ঠুর শখ।' যখন তাঁকে বুঝিয়ে বললাম ঐ হরিণের স্বভাবের কথা, তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তার পরেই বললেন, 'তার এই স্বভাবের জন্যে তোমরাই দায়ী, তাকে তোমরা আদর-যত্ন করলে কখনোই তার স্বভাব এরকম হত না। নিশ্চয়ই তোমরা তার স্বভাবসুলভ গুঁতোবার সামান্য খেলার জন্যে তাকে কোনো রকম মার-ধর করেছ— সেইজন্য সেও তোমাদের প্রতি বিরূপ হয়েছে।'

এখানে এই কথাও বলে রাখি যে পাখিকে পোষবার শখের জন্যে খাঁচায় বন্দী করে রাখা আর পশুদের দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখার ঘোর বিরোধী ছিলেন রবীন্দ্রনাথও। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে গেল। একবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বোটে করে গঙ্গায় বেড়াবার সুযোগ ঘটেছিল আমার। বোটে তাঁর সঙ্গে সাত-আট দিন থাকতে হয়েছিল। তিনি বোটে রাত্রিতে নিজের কক্ষে ঘুমতে যাবার সময় ছাড়া অপর যে কক্ষটিতে সারাদিন কাটাতেন সে

কক্ষটি ছিল অপেক্ষাকৃত বড়ো। সেই কক্ষের মাঝখানে থাকত একটি ছোটো টেবিল। টেবিলের একধারে ছিল আমার শোবার খাট, বিছানা, আর একটি ছোট্ট চেয়ার। টেবিলের অন্য দিকে ছিল একটি বড়ো গোছের চেয়ার— বোটের একটি জানালা ঘেঁষে। সেই চেয়ারটিতে সামান্য হেলান দিয়েও বসা যেত। সেই চেয়ারে বসেই তাঁর সারাদিন কাটত। দিবানিদ্রা বলে তাঁর কোনো বালাই ছিল না। সেই চেয়ারে বসেই প্রয়োজনমতো দু-একখানা বই যা হাতের কাছে ছিল তাই পড়তেন আর প্রয়োজনমতো সামান্য কিছু কিছু লিখতেন আর আমার সঙ্গে গল্পসল্প করতেন। মাঝে মাঝে বনমালী কাছে এলে তার সঙ্গেও কিছু হাস্যপরিহাস করতেন। কখনো কখনো মাঝি-মাল্লাদের কাউকে কাউকে ডেকে তাদের সংসারের সুখদুঃখের কথা শুনতেন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাদের সব অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করতেন। একদিন এরকম কথাবার্তার সময় একজন মাঝিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কালকের বড়ো মাছটা তোমাদের কেমন লাগল?' মাঝি তাঁর কথার জবাব দেবার আগেই সঙ্গে সঙ্গে, তাঁর অষ্টপ্রহরের প্রিয় ভৃত্য বনমালী বললে, 'সে মাছ তো এখনো জ্যান্ত আছে, সুধাকান্তবাবু তো তার কানকোর ফাঁক দিয়ে একটা সরু দড়ি ঢুকিয়ে তার গলায় বেঁধে নদীতে ছেড়ে দিয়েছেন। লম্বা দড়ি, তার একদিক বোটের সঙ্গে বাঁধা আছে, মাছটা এখনো বেশ জ্যান্ত আছে। দড়ি একটু টানলেই মাছটা বেশ ঘাই মারে।' বনমালীর কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ আমার উপর ভীষণ রেগে উঠলেন, আমার দিকে তাকিয়ে অনতিউচ্চ স্বরে বললেন, 'এ কি করেছিস, এ নিষ্ঠুরতা কেন, জল হল মাছের রাজ্য, তার রাজ্যেই তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছিস, যা এখনই ওটাকে ছেড়ে দে, আর নাহয় তো কেটেকুটে খেয়ে ফেল্। একটা জীবকে কষ্ট দিয়ে এ কেমন আনন্দ!' তাঁর কথা শুনে আমি নিজেও হকচকিয়ে গেলাম। তিনি যে মাছকে ঐরকম ভাবে জিইয়ে রাখার জন্যে অতটা বিরক্ত হবেন এটা আমি কল্পনাও করি নি। বনমালী তাঁকে

এ-কথা না বললেও, আমি নিজেই তাঁকে খুব বাহাদুরি করে বলতাম, কারণ পূর্ববঙ্গে আমি দেখেছি এইরকম মাছের গলায় দড়ি দিয়ে একখণ্ড কলাগাছে ঐ দড়ি লম্বা করে বেঁধে পুকুরে মাছ জিইয়ে রাখা হয়। কাজেই এইরকম মাছ জিইয়ে রাখার মধ্যে একটুও নিষ্ঠুরতা আছে এ-কথা আমার মনে জাগে নি। যাই হোক, আর বিলম্ব না করেই একজন মাঝিকে বললাম মাছটাকে জলের থকে তুলে কেটেকুটে রান্না করে ফেলতে। রবীন্দ্রনাথ যে মাছ না খেতেন তা নয় ; মাছ, মাংস, ডিম খাওয়া সম্বন্ধে তাঁর কোনো আপত্তি ছিল না, কিন্তু সেদিন ঐ রান্না মাছ তিনি আর খেলেন না।

দ্বিজেন্দ্র-প্রসঙ্গে বোটে এই মাছের প্রসঙ্গ এইজন্যেই তুললাম যে বড়ো ভাই দ্বিজেন্দ্রনাথ আর তাঁর ছোটো ভাই রবীন্দ্রনাথের পশুপক্ষী সম্বন্ধে স্নেহমমতার ভাব যে একই রকম ছিল সেটা পাঠকবর্গ যাতে সহজেই বুঝতে পারেন। গলায় দড়ির ফাঁস লেগে পূর্বকথিত হরিণটি মরে যাওয়ার সংবাদ শুনে রবীন্দ্রনাথের মনেও খুব দুঃখ হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, 'মানুষের জীবজন্তু পোষার শখ মেটাবার জন্যে কত পশুপক্ষীকেই কত নির্যাতন সহ্য করতে হয়, তবু আমরা সভ্য !'

একদিন বড়োবাবু নিচুবাংলা থেকে বিকেলবেলায় আশ্রম-বিদ্যালয়ে এসে উপস্থিত। বন্ধুবর শ্রদ্ধেয় নরেন্দ্রনাথ নন্দীর ভাষাতেই বলি ঃ 'সব ছেলেরা মাস্টারমশায়রা বিকেলে খেলার মাঠে— আশ্রম স্তব্ধ, শান্ত, সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ছে মাঠের কোলে। এমনি স্তব্ধ শান্ত দিন— সন্ধ্যার অপূর্ব সন্ধিক্ষণে হঠাৎ এসে প্রাক্-কুটিরের ও লাইব্রেরির মধ্য স্থানে উপস্থিত হলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। কে কে সে-সময় তাঁকে দেখেছিলাম মনে নেই। আমি সেখানে ঘটনাচক্রে উপস্থিত ছিলাম। তিনি এসেই শাস্ত্রীমশায়ের খোঁজ করলেন। আমরা তাঁকে শালবীথির নীচে বসতে বললাম শ্বেতপাথরের লম্বা চৌকিটাতে— তিনি শ্বেতপাথরের চৌকিটাতে বসলেন। শাস্ত্রীমশায় খবর পেয়েই সেখানে এসে হাজির হলেন। তখন বড়োবাবু বললেন, 'দেশের বড়ো অভাব, দেশের বড়ো প্রয়োজন, তাই ভাবছি গীতা

সম্বন্ধে আমি কিছু লিখতে আরম্ভ করব।' এর পরই তাঁর সেই *নিজের তৈরি ছোটো খাতার পৃষ্ঠা মুক্তাক্ষরে ভরে উঠতে লাগল* পাতার পর পাতা। আর এক এক অধ্যায় শান্তিনিকেতনের দোতালা ঘরে সপ্তাহ, দু-সপ্তাহ বাদেই পাঠ হতে লাগল। অধ্যাপক অনেকেই, আমাদের মতো দুই-চার জন অর্বাচীন, আর স্বয়ং ছোটো ভাই রবি সে পাঠে উপস্থিত হতে লাগলেন। গীতাপাঠ— তার অপূর্ব ভাষা— অপূর্ব সূচনা— সবার উপরে অপূর্ব মানুষটির সেই আনন্দময় চেহারা আর হাসির সুযোগ হলে একবার সকলের দিকে অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে প্রাণখোলা হাসিতে ফেটে পড়া, সে এক চিরস্মরণীয় ব্যাপার।'

আর একজন এইরকম ভাবেই বড়োবাবুকে দূরের থেকে এবং সময় সময় তাঁর নিকটে অন্য দু-এক জনের সঙ্গে থেকে আলাপ-আলোচনা শুনে শ্রদ্ধায় হৃদয় ভরে নিতেন এবং বড়োবাবুর ঘরে বাইরে থেকে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখতেন তিনি কি করছেন। বড়োবাবুর ঘরে বনের পাখির কাঠবিড়ালের অবাধ চলাফেরা দেখে বিস্ময় বোধ করতেন, সে দৃশ্য উপভোগ করতেন। ইনি হচ্ছেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য শ্রীসুধীরঞ্জন দাস। ইনি বহুদিন শান্তিনিকেতনে আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। বড়োবাবু সম্বন্ধে তাঁর স্মৃতির কিছু অংশ তাঁর ভাষাতেই বলি— "তিনি শান্তিনিকেতনের একজন বিশিষ্ট আশ্রমগুরু এবং আমাদের সকলের নিত্যস্মরণীয় ও বরেণ্য পুরুষ। তাঁকে দেখেছেন এবং তাঁর নিকট-সান্নিধ্যলাভে ধন্য হয়েছেন এমন লোক এখন আশ্রমে বিরল। নিতান্তই বালক বয়সে তাঁকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কিন্তু সেই দেখা খুবই দূর থেকে দেখা —ভাসা ভাসা দেখা মাত্র। আমরা অনেক সময় ঔৎসুক্যভরে নিচুবাংলায় গিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে তাঁকে দেখে আসতাম। কখনো দেখতাম বই হাতে নিবিষ্ট মনে পাঠরত— কখনো বা কাগজ কেটে নানা রকমের বাক্স তৈরি করছেন। তাঁর চেয়ারের পিঠে ও টেবিলের ওপর কাঠবিড়াল ও শালিক পাখির অবাধ চলাফেরা দেখবার জিনিস ছিল। তাঁর উচ্ছ্বসিত হাসির তরঙ্গ পুব-দক্ষিণ হাওয়ার সঙ্গে

প্রাক্‌-কুটিরেও মাঝে মাঝে শোনা যেত। এমন প্রাণখোলা হাসি *খুব ক্বচিৎ কদাচিৎ শোনা যায়। এক দিকে তিনি ছিলেন শিশুর* মতো সরল, অন্য দিকে ছিলেন প্রবীণ জ্ঞানতপস্বী। তিনি ছিলেন একাধারে কবি ও উচ্চ শ্রেণীর দার্শনিক। বিশ্বমানবিকতায় ভরা ছিল তাঁর মন প্রাণ। একবার জাপানে ভীষণ ভূকম্প প্লাবন হয়ে শহর বিধ্বস্ত হয়ে বহুলোকের প্রাণহানি ঘটে। সেই খবর যেদিন কাগজে বার হল সেদিন সন্ধ্যাবেলায় সেই খবর পড়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে কাগজখানা হাতে করে শান্তিনিকেতনের দোতলায় রবীন্দ্রনাথের কাছে এলেন। গুরুদেবও সে খবর আগেই পড়েছিলেন। দুই ভাই দোতলার গাড়িবারান্দার ছাদে নীরবে বসে রইলেন। কথা বেশি হয় নি, কিন্তু দুজনেরই মুখে সেই মরণাহত অজানা অচেনা জাপানীদের শোচনীয় অবস্থার কথা ভেবে যে অপরিসীম অনুকম্পার ভাব দেখেছি আজ পর্যন্ত তা ভুলতে পারি নি।

প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় নিচুবাংলার চাতালে কত-না আলাপ-আলোচনা চলত তাঁর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের। অ্যাণ্ড্রুজ সাহেব, শাস্ত্রীমহাশয়, নেপালবাবু, জগদানন্দবাবু এবং ক্ষিতিবাবু তাঁর কাছে গিয়ে কত-না বিষয় তাঁর মতামত শুনে আসতেন।"

বড়োবাবুর সঙ্গে শান্তিনিকেতন আশ্রমের কয়েকজন শিক্ষকই যে আলাপ-আলোচনা করতেন, তাঁর কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনতেন তা নয়— বাইরের থেকেও যে-সব বিশিষ্ট জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি শান্তিনিকেতনে আসতেন তাঁরা যে শুধু শান্তিনিকেতন দেখে, রবীন্দ্রনাথ এবং শাস্ত্রীমশায় -প্রমুখ পণ্ডিতদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে ফিরে যেতেন তা নয়— তাঁদের মধ্যে অনেকেই যেমন, স্বনামধন্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, যদুনাথ সরকার, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, অধ্যাপক ফরমিকি, অধ্যাপক তুচ্চি, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, মহম্মদ শহীদুল্লা, বাকে সাহেব, দিল্লী সেন্ট স্টিফেন্স কলেজের প্রিন্সিপ্যাল এস. কে. রুদ্র, জওহরলাল নেহরু— আরো কত বিশিষ্ট ব্যক্তি অল্পক্ষণের জন্যেই হোক আর বেশিক্ষণের জন্যেই হোক বড়োবাবুর কাছে যেতেন তাঁদের শ্রদ্ধা

নিবেদন করতে— তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে এবং তাঁর কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনতে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল 'শোভাঞ্জন' শব্দের যথার্থ অর্থ কি এই নিয়ে বড়োবাবুর সঙ্গে শহীদুল্লা সাহেবের আলোচনা।

'শোভাঞ্জন' শব্দের প্রকৃত অর্থ কি এই নিয়ে এর কয়েকদিন আগে শাস্ত্রীমশায়ের সঙ্গে বড়োবাবুর আলোচনা অল্প দূরের থেকে কিছুটা শুনেছিলাম। শহীদুল্লা সাহেব ভালো সংস্কৃত জানেন জেনে বড়োবাবু তাঁকে 'শোভাঞ্জন' শব্দের প্রকৃত অর্থ কি জিজ্ঞেস করায় শহীদুল্লা সাহেব তৎক্ষণাৎ বললেন, 'আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে "শোভাঞ্জন" সজনে ফুলকে বলা হয়, সজনে ফুলের শোভাও তো আছে, তা ছাড়া শুনেছি সজনে গাছের ছালের রসে অনেক রকম কবরেজি ওষুধও তৈরি হয়।' হঠাৎ কি কারণে জানি না আমি সেখানে তখন উপস্থিত ছিলাম, আমার যেমন হালকা স্বভাব— বিনা সংকোচে বললাম— 'শোভাঞ্জন' কি শুধু শোভাঞ্জন, সজনে ফুলের বড়া খেতেও খুব ভালো, সজনে ডাঁটার চচ্চড়িও ভালো ইত্যাদি। আমার কথা শুনে শহীদুল্লা সাহেব তো হাসলেনই, বড়োবাবু প্রাণখোলা অট্টহাসি হেসে বললেন, 'শুনলেন শহীদুল্লা সাহেব সুধাকান্তের কথা, ইনি একটি ভোজন-রসিক, আজকে বললে সজনে ফুলের বড়া খেতে ভালো; শুধু কি সজনে ফুলের বড়া ও বকফুলের ফুলুরি খেয়েছে, সাপলা ফুলের ফুলুরি খেয়েছে— এ-সব ওর কাছেই শুনেছি, আরো কত ফুল খেয়েছে তা কে জানে!' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গোলাপ ফুলের ফুলুরি খাও নি তো?' তারপরেই আবার অট্টহাসি। বড়োবাবু আর শহীদুল্লা সাহেবের আলাপ-আলোচনার কথা বলছিলুম। সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে, সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে শহীদুল্লা সাহেবের আগ্রহ কেন বিশেষভাবে হল এই কথা বড়োবাবু জিজ্ঞেস করায় শহীদুল্লা সাহেব তাঁকে বললেন কত বিঘ্ন এবং কত অসুবিধার মধ্যেই তাঁকে সংস্কৃত ভাষা শিখতে হয়েছে এবং সংস্কৃত সাহিত্য পড়তে হয়েছে। শহীদুল্লা সাহেবের কথা শুনে বড়োবাবু

বললেন, 'একেই তো বলে সাধনা, আপনি বাহাদুর।' আর-একদিন শুনছিলাম বড়োবাবুর সঙ্গে রামানন্দবাবুর আলোচনা। আলোচনার বিষয় ছিল 'হিন্দু'। বড়োবাবু রামানন্দবাবুকে বলেছিলেন, 'আমি হিন্দু, ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হিন্দু।' তারপর আলোচনা হল ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন জাতি বা ধর্ম-সম্প্রদায়ের কাদের হিন্দু বলা চলে। এই আলোচনা আমি খুব আগ্রহের সঙ্গে শুনেছিলাম কেননা আমি হিন্দু হলেও অধিকাংশ হিন্দুরা যে-সমস্ত হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকেন তার অধিকাংশই আমার মনে কোনো প্রভাব বিস্তার করে না। অথচ আমি নিজেকে হিন্দু বলেই স্বীকার করি। কাজেই কাদের হিন্দু বলা চলে সে সম্বন্ধে এই দু-জনের আলোচনার সারমর্ম কি দাঁড়ায় জানবার জন্যে আমার আগ্রহ বেড়ে চলল। এঁদের দু-জনের নানা তর্কযুক্তি থেকে যে অর্থ আমি বুঝেছিলাম তার মর্ম হচ্ছে এই যে, ভারতবর্ষ হতে যে-সমস্ত ধর্ম উদ্ভূত যেমন বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম, আর্য ধর্ম, ব্রাহ্ম ধর্ম, শিখ ধর্ম, তাদের অনুবর্তী সকলকেই হিন্দু বলা অযৌক্তিক নয়, যদিও এই-সব সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের কেউ বলেন আমি ব্রাহ্ম, আমি জৈন, আমি বৌদ্ধ, আমি আর্য সমাজী, আমি শিখ।

এ-কথা বোধ হয় সকলেই জানেন যে রামানন্দবাবু ব্রাহ্ম হলেও একসময় হিন্দু মহাসভার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং নিজেকে 'ব্রাহ্ম হিন্দু কিংবা হিন্দু ব্রাহ্ম' বলতেন। পরে একদিন কলকাতায় বিপিনচন্দ্র পাল মশায়ের বাড়িতে এই 'হিন্দু'র বিষয় অল্প কিছুক্ষণ আলোচনা করেছিলাম। তাঁর উত্তর শুনেও এই কথা বুঝেছিলাম যে তিনিও বড়োবাবুর 'হিন্দু'র ব্যাখ্যা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেন। এই-সব আলোচনা শোনার ফলে আমার মনে আমি যে 'হিন্দু' এই স্বীকৃতি আরো বদ্ধমূল হল।

'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ' এই কথার মানে কি এই বিষয় বড়োবাবুকে প্রশ্ন করেছিলাম, তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'এ-কথার অর্থ গভীরভাবে বিশ্লেষণ ক'রে তোমাকে বোঝাবার চেষ্টা

করলে সে চেষ্টা আমার ব্যর্থ হবে— কেননা তুমি তা হজম করতে পারবে না, যা বুঝতে পারবে সেই কথাই তোমাকে বলি শোনো : বাঘ একটা জন্তু আর হরিণও একটা জন্তু। কিন্তু তাদের নিজের নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে তাদের দেহের গঠনপ্রণালী এবং খাদ্যবস্তু এক হয় নি। হরিণের দেহের গঠন আর চালচলন যেমন, বাঘের দেহের গঠন চালচলন তেমন নয়— বাঘের দেহের গঠন, দেহের শক্তি, তার খাদ্য এই-সবই তার অস্তিত্ব রক্ষার পক্ষে সহায়ক। হরিণের দেহের গঠন, তার খাদ্য তার অস্তিত্ব রক্ষার সহায়ক। কিন্তু একবার ভেবে দেখ যদি হরিণ মনে করে তাকে বাঘের মতো বলিষ্ঠ হতে হবে, বাঘের পায়ের মতো পা মোটা মোটা করতে হবে তা হলে তার দশা কি হয়। সে হল বাঘের খাদ্য, বাঘ তাকে তাড়া করলে সে তার নিজের লিকলিকে পা-চারটির জোরে স্প্রিঙের মতন লাফ দিয়ে দিয়ে দ্রুত গতিতে যে-রকম ভাবে পালিয়ে গিয়ে প্রাণরক্ষা করতে পারে, তার পা যদি বাঘের মতো মোটা মোটা হত আর সে ওজনেও যদি ভারী হত তা হলে কি বিদ্যুৎ-বেগে পালিয়ে বাঘের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে? নিশ্চয়ই না। পক্ষান্তরে বাঘও যদি মনে করত হরিণকে দৌড়ে ধরে ফেলবার জন্যে তার পাগুলি লিকলিকে করতে হবে তা হলে কি সে নিজের ওজনভারী শরীর নিয়ে হরিণের মতো দৌড়তে পারত? নিশ্চয়ই পারত না। এই দুটি জীব যদি নিজের দেহের ধর্মকে অদলবদল করে নিত তা হলে দুজনেরই মরণ হত। বাঘ তার লিকলিকে পায়ে ভারী ওজনের শরীর নিয়ে কিছুতেই দৌড়ে হরিণের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত না, তার শিকার ফসকে যেত, সে না খেয়ে মরত। আর হরিণের যদি লিকলিকে পায়ের বদলে মোটা মোটা মাংসল ভারী পা হত তা হলে সেও বাঘের আক্রমণ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে দ্রুত-বেগে দৌড়ে পালাতে পারত না। এ গেল এই দুই জন্তুর দেহধর্মের অথবা দেহগঠনের স্বাতন্ত্র্যের কথা। খাদ্যের দিক দিয়েও ভেবে দেখ, বাঘের দাঁত, চোয়াল, মাংস হাড় চিবিয়ে খাবার উপযোগী। সে যদি

হঠাৎ মনে করে জন্তু শিকার করে খাওয়ার চেয়ে ঘাস খাওয়াই ভালো তা হলে সে না খেয়েই মরবে, কেননা তার দাঁত তার চোয়াল জন্তু ধরে খাবার মতন, ঘাস খাবার মতন নয়। হরিণও যদি মনে করে সে ঘাস খাবে না খরগোস-টরগোসের মতো -নিরীহ জীবজন্তু ধরে খাবে তা হলে তারও মরণ, কেননা তারও দাঁত, চোয়াল, মাংস খাবার মতন নয়, ঘাস খাবার মতন। এ ছাড়া তাদের উভয়ের প্রকৃতিগত স্বভাবও স্বতন্ত্র। এই-সব অমিল নিয়েই এই দুটি জন্তুর অস্তিত্ব রক্ষার ধর্মও আলাদা। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো এই দুটি জন্তুর মধ্যেও একটা প্রকৃতিগত স্বাভাবিক ধর্মের ঐক্য আছে, সেটা হচ্ছে অস্তিত্ব রক্ষার প্রাণপণ চেষ্টা। এই চেষ্টার জন্যেই এই দুটি জন্তু নিজের নিজের জীবধর্ম অনুযায়ী জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। তাই বলেই অরণ্যে বাঘও বেঁচে আছে হরিণও বেঁচে আছে। এইরকম ভাবে বেঁচে থাকা মানে অনেক হরিণ বাঘের পেটে গিয়েও অনেক হরিণ বেঁচে আছে এবং অনেক বাঘ সব সময় জন্তু শিকার করে খেতে না পেয়েও বেঁচে আছে। কিন্তু এরা যদি নিজের নিজের ধর্ম ত্যাগ করত তা হলে এদের কি দশা হত একবার ভেবে দেখ দেখি?' এই বলে বড়োবাবু আবার বললেন, 'আজকের মতো এই আলোচনা থাক্, এ নিয়ে আর তর্ক কোরো না। তুমি তো কীটপতঙ্গ পাখি এ-সব নিয়ে পর্যবেক্ষণ কর। ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে দেখো কোন্ কোন্ কীট কি কি উপায়ে পাখির আক্রমণ থেকে আত্ম-রক্ষার চেষ্টা করে আর কোন্ কোন্ পাখিই বা কি কি উপায়ে বাজ-পাখির আক্রমণ থেকে চিলের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করে। এই-সব ভালো করে দেখো, বোঝো।' তাঁর কথা শুনে আমি বললাম, 'আমি তো পশুপাখির ধর্মের বিষয় আপনাকে প্রশ্ন করি নি, আমি তো প্রশ্ন করেছিলাম মানুষের ধর্মের কথা ভেবে অর্থাৎ মানুষের স্বধর্ম বলতে কি বোঝায়।' তিনি আমাকে যা বললেন তার সারমর্ম হচ্ছে এই যে একজন N. P. P.-র পক্ষে অর্থাৎ একজন না-পড়া পণ্ডিতের পক্ষে, এই প্রশ্নের জবাব বোঝা কঠিন হবে।

সেদিন সান্ধ্যভোজন শেষ হবার পর দেখলাম বড়োবাবুও খাবার টেবিল ছেড়ে নিজের বই পড়বার চেয়ারে বসবার জন্যে ব্যস্ত, সেই চেয়ারের সামনে টেবিলের উপরে একটা মোটা বইও আছে। খাওয়াদাওয়ার পাট শেষ করে যদিও উঠে পড়লাম, তবুও বারান্দার আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম এই ভেবে যে বড়োবাবু খাবার পর বিশ্রাম করবেন অথবা তখনই লিখবেন কিংবা পড়বেন। কিছুক্ষণ পরে ঘরের দরজায় উঁকি দিয়ে দেখলাম তিনি বই পড়ছেন। অগত্যা সেখান থেকে চলে গেলাম অন্দরমহলে বড়োমার কাছে। সেখানে গিয়ে কিছু ঘরোয়া গল্পসল্প করে আশ্রমে ফেরবার পথে আর-একবার বড়োবাবুর ঘরে উঁকিঝুঁকি দিলাম, দেখলাম তিনি তখনো নিবিষ্টচিত্তে পাঠরত। তার পরদিন সকালে মুনীশ্বরকে জিজ্ঞাসা করলাম বড়োবাবু কাল রাত্রিতে কতক্ষণ পর্যন্ত বই পড়েছিলেন। মুনীশ্বরের কাছে জানতে পারলাম বড়োবাবু এমনই নিবিষ্টচিত্তে পড়ছিলেন যে তাঁকে যদি স্মরণ না করিয়ে দেওয়া হত যে রাত্রি দশটা বেজে গেছে তা হলে হয়তো বই পড়েই রাত কাটিয়ে দিতেন। আরো জানতে পারলাম যে আজ সকালেই তিনি খাতাপত্র গুছিয়ে কী-একটা লেখবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। কাজেই আর বড়োবাবুর ঘরে ঢোকবার সাহস হল না। দূরের থেকে উঁকি দিয়ে দেখলাম তিনি চেয়ারে হেলান দিয়ে কপালে চশমা তুলে চোখ বন্ধ করে চুপ করে আছেন। বুঝলাম যে একটু বিশ্রাম করেই লিখতে বসবেন।

আর-একদিন সকালে বড়োবাবুর সঙ্গে জলযোগের পালা শেষ করে চলে আসার উপক্রম করছি এমন সময় বড়োবাবু বললেন, 'কি হে পণ্ডিত, আজকে কি কেবল খেয়েই চলে যাবে? আজকে কি তোমার কোনো বিষয় প্রশ্ন করবার নেই?' বড়োবাবুর কথার উত্তরে আমি বললাম, 'কয়েকদিন ধরেই মনে কয়েকটি প্রশ্ন উঠেছে, কিন্তু আপনার কাছে যেমন সহজভাবে প্রশ্ন করে উত্তর আশা করি তেমনভাবে অন্য পণ্ডিতদের কাছে প্রশ্ন করতে সাহস হয় না; তাঁরা

এক কথায় মামলার নিষ্পত্তি করে দেন অর্থাৎ তাঁরা বলেন অমুক-তমুক বই পড়ো, তাতেও যদি তোমার প্রশ্নের উত্তর না পাও তখন আমার কাছে এসো বুঝিয়ে দেব। কিন্তু আপনি মূর্খকে ধৈর্য ধরে এমন-সব কথা বুঝিয়ে বলেন যে-সব কথা বই পড়ে জানতে হলে আমার তো কিছুই জানা হবে না, কেননা মন দিয়ে ধৈর্য ধরে বই-টই পড়া আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ, আর যদি বা কোনো সিরিয়াস বিষয় বই পড়বার ইচ্ছে থাকেও তা হলেও বই পড়তে গিয়ে বিপদে পড়ি, কেননা বইতে যে-সব কথা লেখা থাকে তার অর্থ এবং মর্ম বোঝবার মতন বিদ্যেবুদ্ধি আমার নেই, কাজেই যা শুনে বুঝি আর আমার অভিজ্ঞতার সঙ্গে যা বুঝেছি তার যদি মিল থাকে তবেই সেই শোনা কথা মনের মধ্যে ক্রিয়া শুরু করে আর সেই সূত্রে অন্য দশটা আনুষঙ্গিক বিষয়বস্তু চিন্তা করি।' আমার এই কথা শুনে বড়োবাবু বললেন, 'আজ সকালে আমার লেখাপড়ার তেমন কাজ নেই, আজ কাগজ দিয়ে আমার ছোটো ছোটো খাতাপত্র কলম পেন্সিল ছুরি কাঁচি রাখার খোপ তৈরি করব। এমনভাবে খোপগুলো তৈরি করব যেন ছোট্ট একটা চৌকোনা বাক্সের মধ্যে খোপগুলো আছে— এই কাজটা আরো কিছুক্ষণ পরে করলেও কিছু ক্ষতি নেই, অতএব তুমি ইচ্ছে করলে কয়েকটা প্রশ্নবাণ ছুঁড়ে আমার উত্তর শুনে কিছু মনের চিন্তার খোরাকও জোগাড় করে নিতে পার। আর যদি প্রশ্ন না করতে চাও তা হলে আশ্রমের কিছু খবর-টবর বলে স'রে পড়ো।— এই যাঃ, আজকে দেখছি আর কাগজের খেলা হল না, আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম অ্যাণ্ড্রুজ সাহেব সকালেই আসবেন আমার কাছে, তিনি এলে তো আমি গল্প শুনব, তিনি গল্প করবেন সংবাদপত্র থেকে সন্দেশ জোগাড় করে এনে। এই কাজের ভার আমিই তাঁকে দিয়েছি, তিনি না এলে আর এই-সব খবর না দিলে আমি খবর শোনবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠি আর মুনীশ্বর ও গোষ্ঠকে বলি, যাও সাহেবকে ডেকে আনো। তারা তো চলে যায় সাহেবকে ডাকতে, তাড়াতাড়ি ফিরে আসে না। সাহেব তো শাস্ত্রীর

মতন নন, শাস্ত্রী তো এক জায়গায় বসে নিজের কাজকর্ম করেন, তাঁর সন্ধান চট করে পাওয়া যায়। কিন্তু অ্যাণ্ড্রুজ সাহেব কখন যে কোথায় থাকেন তাঁর পাত্তা পাওয়াই মুশকিল, কখনো থাকেন বেণুকুঞ্জে নিজের ঘরে, কখনো যান শাস্ত্রীর কাছে, কখনো রবির কাছে, কখনো পিয়ার্সনের সঙ্গে সাঁওতাল-পল্লীতে বেড়াতে যান। কি দুর্দৈব বলো তো! একজন লোককে খুঁজতে কটা মুনীশ্বর পাঠাব? সাহেবকে খুঁজতে গিয়ে মুনীশ্বর দেরি করে ফিরলে এদিকে আমার কাজের অনেক অসুবিধা হয়ে যায়, তোমাদের খুঁজে বেড়াবার জন্যে কত লোক রাখব বলো দেখি। সাহেব দেরি করে এলে সাহেবকে বকুনি দিই, সাহেব হাসে আমিও সাহেবের সঙ্গে হাসি, দু-জনে হাসাহাসি করে সময় কাটিয়ে দিই— তার পর সন্দেশ শোনার পালা।' তাঁর কথা শুনে আমি বললাম, 'সন্দেশ তো লোকে খায়, সন্দেশ আবার শোনে কেমন করে?' আমার কথা শুনে তিনি অট্টহাসি হেসে বললেন, 'সাধে কি তোমায় N. P. P. বলি। "সন্দেশ" সুখাদ্য হলেও আসলে তার অর্থ হচ্ছে সংবাদ।' তখন আমি বললাম, '"সংবাদ"টাকে এইরকম একটা সুখাদ্যের নাম দেওয়া হল কেন? "সন্দেশ" যদি সংবাদই হবে তা হলে তো এই প্রশ্নই মনে জাগে যে যদি সংবাদের ভাবার্থ মিষ্ট হয় তা হলে অমিষ্ট সংবাদ অর্থাৎ খারাপ সংবাদকেও মিষ্টি সন্দেশ বলা হয় না কেন?' বড়োবাবু আবার অট্টহাসি হেসে বললেন, 'এইবার ঠিক প্রশ্ন করেছ। তোমার মতন পণ্ডিতের পক্ষে এই প্রশ্ন সংগত। এর উত্তর বলি শোনো, হ্যাঁ— সংবাদ তেতোও হয় মিষ্টিও হয় এ-কথাটা ঠিক। কিন্তু আমাদের দেশে একটা প্রচলিত রীতি আছে যে সামাজিক কোনো শুভ অনুষ্ঠান উপলক্ষে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে শুভ সংবাদ যে নিয়ে যেত তার সঙ্গে কয়েক রকম মিষ্টিও পাঠানো হত। অন্যান্য প্রদেশে কিরকম মিষ্টি পাঠানো হয় জানিস। আমাদের বাংলাদেশে যে কয়েক রকম মিষ্টি পাঠানো হয় তার মধ্যে "সন্দেশ"-জাতীয় মিষ্টি পাঠাবার চলনটাই বেশি, আজও হয়তো আছে। এইজন্যেই শুভ-

সংবাদের একটা প্রতীকস্বরূপ হচ্ছে সন্দেশ। যারা সংবাদ নিয়ে যায় তাদের বলে সন্দেশবহ। এইবার বুঝলে তো সন্দেশ-তত্ত্ব। এইবার তোমার কি প্রশ্ন আছে বলো।'

বড়োবাবুর কাছে নানারকম প্রশ্ন করবার দুঃসাহসটা ক্রমে আবদারে পরিণত হল তাঁর কাছে অত্যধিক প্রশ্রয় পেয়ে। তাই তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করলাম— 'সুন্দরী' শব্দের ব্যাখ্যা কি। আমার প্রশ্ন শুনে তিনি বললেন, 'সুন্দরী বলতে তুমি কি বোঝ আগে তাই বলো তার পর আমার যা বলবার বলব।' তাঁর কথা শুনে আমি তো কতকটা যেন বেকুব ব'নে গেলাম, মনে হল নিজের প্রশ্নের জালে নিজেই জড়িয়ে গেছি। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। কি যে জবাব দেব বুঝতেই পারছি না। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে তিনি বললেন, 'কি হে, চুপ করে রইলে যে, বলো সুন্দরী সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি?' আমি তখন সুন্দরী কাকে বলে প্রচলিত ধারণামতে খুব ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতে শুরু করলাম— যার একজোড়া পটলচেরা চোখ, ঢলঢলে চোখ, কাজল-কালো চোখ, বেশ কালো ভুরু, পানের মতন গড়ন মুখ,মানান সই নাকের উঁচু গড়ন, বেশ সুগোল গণ্ড, নধর অধর, ভালো গড়ন গ্রীবা ইত্যাদি। আমার কথা শুনে তিনি বললেন, 'বেশ, ধরা যাক তোমার ধারণাই ঠিক, কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তা হলে কি তোমার ধারণামতো যে-নারীর সুন্দর চেহারা নয় সে কি তবে অসুন্দরী? যার গোল মুখ, ফরসা রঙ, দেহ গঠন ভালো, চোখও ভালো, হাসিও ভালো সে কি তবে তোমার চোখে সুন্দরী নয়? তা যদি না হয় তা হলে কি তুমি বলতে চাও তোমার মতে সব সুন্দরীর নাক, চোখ, কান, দেহের গঠন এক ছাঁচেই তৈরি— যারা ঐ ছাঁচে তৈরি নয় তারা কি সকলেই বিশ্রী, কুৎসিত?' এই বলে তিনি আবার একচোট অট্টহাসি হেসে বললেন, 'আজকে তোমাকে বাগে পেয়েছি! দাও আমার প্রশ্নের জবাব দাও।'

বড়োবাবুর প্রশ্নের জবাব কি দেব ভেবেই ঠিক করতে পারলাম

না; ঠিক করতে না পারলেও এমন ভান করলাম যেন জবাব দিতে পারি। তাঁকে বললাম, 'আপনার প্রশ্নের জবাব এখন দেব না, কালকে দেব। এখন অ্যাণ্ড্রুজ সাহেবের আসবার সময় হয়ে আসছে।' তিনি বললেন, 'তা হলে আজ পালাচ্ছ, পালাও, কাল কিন্তু এসে তোমার জবাব শুনিয়ো।' এই বলে আর একচোট অট্টহাসি হাসলেন।

পরের দিন বিকেলে বড়োবাবুর কাছে উপস্থিত হয়ে প্রণাম করে পাশের মোড়ায় বসেই বড়োবাবুকে কোনো প্রশ্ন করবার সুযোগ না দিয়েই বললাম, 'আমি সত্যিই আমার নিজের প্রশ্নের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়েছি, এ জাল থেকে বেরোবার পথ আপনিই বলে দিন। কথায় বলে 'বাঁশ বনে ডোম কানা'— আমার অবস্থাও হয়েছে সেই রকম।' আমার কথা শুনে বড়োবাবু সস্নেহে আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, 'অত বিব্রত বোধ করছ কেন! তুমি কেন, অনেকেই এক-একটা ধারণা পোষণ করেন, কিন্তু সেই ধারণাকে বিশ্লেষণ করে পরীক্ষা করেন না। আচ্ছা, যা বলি তাই শোনো— আমিও তোমার প্রশ্ন নিয়ে কিছু চিন্তা করেছি, সেই চিন্তা অনুযায়ী তোমাকে যা বলব সেটা তোমার মনে ধরে কিনা সে বিচার তুমি কোরো, এই বিচার করার চিন্তার খোরাক তোমাকে দিচ্ছি— যখন সুন্দরীর কথাই তুললে তা হলে এটা ধরে নিচ্ছি যে পুরুষ কি চোখে, কি মন দিয়ে নারীর সৌন্দর্য উপভোগ করে। এই উপভোগের গোড়ার কথা হচ্ছে নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণ। এই আকর্ষণের মধ্যেও সব পুরুষের স্বাতন্ত্র্য আছে। এমন তো হতে পারে যে, যে মেয়ে তোমার চোখে তেমন সুন্দর নয় সেই মেয়েটিই হয়তো আর-একজনের চোখে পরমাসুন্দরী। এমনও দেখা গেছে যে অনেকের চোখে যে মেয়ে শুধু অসুন্দর নয় কুৎসিত— সেও আবার কারো চোখে খুবই সুন্দর। কাজেই এই সৌন্দর্যতত্ত্বের ব্যাখ্যা করা খুব সহজ নয়। বিষয়টি কবিতা লেখায় যেমন সহজ— যৌক্তিকভাবে গদ্যে বিশ্লেষণ করে বলা তেমন সহজ তো নয়ই বরং খুব কঠিন। যেমন ধরো, সাহিত্যের

কথা— প্রকৃত সাহিত্য কি, তার স্বরূপ কি, তার ধর্ম কি, বড়ো বড়ো সাহিত্যিকরাও তার ব্যাখ্যায় একমত নন, নানা মুনির নানা মত। কাজেই এই মত-বৈচিত্র্যের অরণ্যের মধ্যে ঢুকে কাজ নেই। তোমার ধারণাকে তুমি ভালো করে যাচাই করে দেখো এই এই পয়েন্ট নিয়ে— তোমার ধারণা সুন্দরীর সর্বাঙ্গের একটা অংশ হল পটলচেরা চোখ, চক্ষুগোলক কালো। তা হলে ইওরোপীয় যুবতীর নীলবর্ণ চক্ষু-গোলক আর কটা রঙের কেশদাম কি ইওরোপীয় যুবকের মনে নারীর সৌন্দর্যের কোনোই ছাপ দেয় না? নিশ্চয়ই সেই নীল চোখ আর সেই কটাসে রঙের কেশদাম ইওরোপীয় যুবকের চোখে সৌন্দর্যের মোহ সৃষ্টি করেই। চীনা যুবতীদের কথাই ধরো-না কেন, তাদের মুখের গড়ন প্রভৃতি তো আমাদের দেশের সুন্দরীদের চেয়ে বিভিন্ন, তাই বলে কি তারা চীনা যুবকদের চোখে সুন্দরী নন? নিশ্চয়ই সুন্দরী। ঐ-সব সুন্দরীদের স্তব করে হয়তো কত চীনা কবি কবিতা লিখেছেন। এইবার ফুলের কথা ধরা যাক। কাব্যে কবিতায় রজনীগন্ধা, বেলফুল, শ্বেতশতদল, ঝুমকো ফুল, যূথিকা এইরকম কত ফুলের প্রশংসা আছে— আরো অনেক রকমের ফুল আছে যেমন গোলাপ, টগর, চাঁপা এরাও সুন্দর ফুল, এদেরও স্থান কাব্য-কবিতায় আছে। কিন্তু গাঁদা ফুল, তেঁতুল ফুল, সজনে ফুল, বক ফুল, এইরকম আরো কত ফুলের ছড়াছড়ি কাব্যে কবিতায় তেমন নেই, হয়তো কোনো কোনো কবি এই-সব ফুলের সম্বন্ধেও কবিতা লিখে থাকতে পারেন। কিন্তু এ কথাটা তো ঠিক যে কাব্যে কবিতায় যে-সব ফুলের প্রায়ই বর্ণনা পাওয়া যায় সে-সব ফুলের সৌন্দর্যে সকলেই যে মুগ্ধ তা নয়, তবু যে এই-সব ফুলের সৌন্দর্যের কীর্তন করে থাকেন তার কারণ আমার মনে হয় অনেকেই এই-সব ফুলের সৌন্দর্যের কথা শুনে শুনে কাব্যে কবিতায় প'ড়ে প'ড়ে একটা কল্পিত ধারণাকে নিজের ধারণা ব'লে স্বীকার করে নিয়েছেন, এই ধারণা তাঁদের মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। এই ধারণানুযায়ী শ্বেত শতদলে যে সৌন্দর্য অনেকে দেখতে

পান তাঁরা তো কই ঐ গোলাপী রঙের পদ্মফুলের বর্ণনা খুব স্বচ্ছন্দে করেন না। কিন্তু এমন তো অনেক লোক আছেন যাঁরা তাঁদের টেবিলের ফুলদানিতে গোলাপী রঙের পদ্মফুল, গাঁদা ফুল সযত্নে দিনের পর দিন সাজিয়ে রেখে তাদের সৌন্দর্য উপভোগ করেন। তা হলে কথাটা এই দাঁড়াচ্ছে যে এক এক জন লোকের চোখে মনে এক-এক রকমের ফুলের বর্ণ, সৌন্দর্যের মোহ সৃষ্টি করে। এই ফুলের রাজ্যেও সৌন্দর্যের একটা বাঁধাধরা স্ট্যাণ্ডার্ড নেই। যে স্ট্যাণ্ডার্ড আছে সেটা কিন্তু প্রচলিত মতকে আশ্রয় ক'রে, ব্যক্তি-বিশেষের সৌন্দর্যের রুচি সেই স্ট্যাণ্ডার্ডের প্রথাকে অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করে। তবুও এর ব্যতিক্রম হয় এক একজনের নিজস্ব সৌন্দর্য-বোধের দ্বারা। এইজন্যেই কেউ হয়তো শ্বেতশতদলের চেয়ে গোলাপী শতদলের প্রতি বেশি আকৃষ্ট— চন্দ্রমল্লিকা, রজনীগন্ধা, বেলফুলের চেয়েও গাঁদা ফুলের প্রতি বেশি আকৃষ্ট। তা হলে এই অনুমান করা অসংগত নয় যে প্রচলিত মতের রুচি ছাড়াও মানুষের এ সম্বন্ধে একটা স্বতন্ত্র রুচি আছে, স্বতন্ত্র রুচি আছে বলেই কাব্যে কবিতায় খুব বেশি পাঙ্‌ক্তেয় না হয়েও এরা ফুলের রাজ্যে মানুষের যত্নে টিঁকে আছে। এখন চিন্তা করে দেখো এই সৌন্দর্য উপভোগের কারণ কি।'

সেদিন বড়োবাবুর কাছ থেকে এই-সব কথা শুনে বাড়িতে ফিরে এসে ফুলের সৌন্দর্য সম্বন্ধে যত-না বিচার চিন্তা করেছিলাম তার চেয়েও ঢের বেশি এই কথাই মনে হচ্ছিল যে বড়োবাবুর অসাধারণ প্রকৃতি। তিনি আমার মতন একজন অর্বাচীন, নিতান্তই সাধারণ যুবকের সঙ্গে এমনভাবে ঐ-সব আলোচনা করেছিলেন যেন তাঁর সমবয়সী একজন সমঝদার লোকের সঙ্গে আলোচনা করছেন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল শোনা কথা যে তিনি যখন 'স্বপ্নপ্রয়াণ' লিখছিলেন তখন যাকে হাতের কাছে পেতেন তাকেই 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র কবিতা পড়ে শোনাতেন তাঁর খেয়ালও হ'ত না যে যারা শ্রোতা তাদের বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় কতটা। তিনি সকলকেই মানব পর্যায়ে

স্থান দিতেন নিজের মনে। মানুষের প্রতি তাঁর একটা অকৃত্রিম ভালোবাসা স্নেহ ও শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর এই প্রকৃতি দেখে বেশিক্ষণের জন্যে না হোক কিছুক্ষণের জন্যে নিজের সামাজিক মর্যাদার গর্বিত কৌলীন্য-বোধ মনের থেকে ঘুচে যেত। তিনি উপদেশ দিয়ে কোনো-দিনই আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করেন নি যে সহজ সরল মানুষ হতে গেলে কী কী গুণ চর্চা করা দরকার। তাঁর স্বভাবসুলভ আচরণ ব্যবহার আমাদের বুঝিয়ে দিত সুশিক্ষিত মানুষ কাকে বলে। ঘরে ফিরে এসে ক্রমাগতই সেদিন ভেবেছিলাম এরকম মানুষ আর ক'জন আছেন।

পূর্বেই বলেছি বড়োবাবুর মনে সকল স্তরের মানুষের প্রতি একটা স্নেহমমতা ছিল, সেই স্নেহমমতার মধ্যে কোনো 'উচ্চনীচ' ভাব ছিল না। স্বচক্ষে দেখেছি— একদিন সকালে যখন তিনি জলযোগ করছেন সেই সময় তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল একটি পাঁচ-ছয় বছরের ছেলে, ছেলেটি তাঁর ভৃত্য মুনীশ্বরের। ছেলেটির অঙ্গ-বস্ত্র মলিন, তার নাক দিয়ে সর্দি ঝরছে। বড়োবাবু তাকে দেখে স্বাভাবিক প্রকৃতিমতো রেগে উঠলেন। সেই রাগের মধ্যে ছিল বালকটির প্রতি স্নেহমমতা— রাগ ছিল মুনীশ্বরের প্রতি। বড়োবাবু তৎক্ষণাৎ বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে নিজের রুমাল দিয়েই ছেলেটির নাক ভালো করে মুছে দিলেন এবং ছেলেটির হাতে একটা বিস্কুট দিয়ে বললেন— খাও। ছেলেটি বিস্কুট হাতে নিয়েই বাড়ির দিকে মার দৌড়। তার পরেই মুনীশ্বরকে তলব হল। মুনীশ্বর তাঁর সামনে উপস্থিত হতেই তাকে ধমকাতে শুরু করলেন এই বলে— 'তোমার ছেলেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখ না কেন? ঐটুকু ছেলে কি নিজেকে নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে? আমি তাকে পরিষ্কার করে দিয়েছি। বেচারাকে বিস্কুট দিলাম খেতে, ও-বেচারা বিস্কুট নিয়ে খাবে আমি দেখব তা হল না, সে আমার বকাবকি শুনে ভাবলে তাকেই বকছি, সে বিস্কুট নিয়ে ভয়ে পালিয়ে গেল। এই বকুনি তোমাকে দিচ্ছিলাম, তুমি কোথায় ছিলে।' মুনীশ্বর চুপ

করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বললে, 'আর এরকম হবে না।' বড়োবাবু মুনীশ্বরের কথা শুনে বললেন, 'যাও, ওকে আবার আমার কাছে পাঠিয়ে দাও, ওকে আর-একটা বিস্কুট দেব। অনর্থক ও-বেচারার মনে কষ্ট দিলাম তোমার জন্যে। ও তো কিছু দোষ করে নি।' বড়োবাবু আমাকে বললেন,'যাও, তুমি বিস্কুট দিয়ে এসো। মুনীশ্বরের হাতে বিস্কুট দিতাম, কিন্তু দিলাম না এই ভেবে যে আমার বকুনি খেয়ে মুনীশ্বর ক্ষুণ্ণ হয়েছে, সেই ক্ষুণ্ণ ভাবের ঝাল হয়তো ছেলেকে গিয়ে ঝাড়বে— যাও তুমি, এক্ষুনি গিয়ে দিয়ে এসো।' অগত্যা আমার ভাগের খাবার শেষ না করেই তৎক্ষণাৎ তাঁর আদেশ পালন করে এলাম। আমাকেও একটা বিস্কুট দিয়ে বললেন, 'নাও, তুমিও একটা বিস্কুট খাও।' তার পরেই আবার মুনীশ্বরকে ডেকে বললেন, 'দেখো, তুমি এই নিয়ে তোমার ছেলেকে বকাবকি কোরো না।' মুনীশ্বর ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই ঢুকে পড়ল ঘরে একটি ময়লা রঙের শাদা কুকুর। সে এসে বসল বড়োবাবুর পায়ের কাছে। তখন জলযোগের পালা শেষ। বড়োবাবু তাঁর টেবিলের চারি দিকে হাতড়ালেন— কোথাও কিছু নেই, সব শেষ, এক টুকরো বিস্কুটও নেই। বড়োবাবু বিষম সমস্যায় পড়লেন। বললেন, 'তাই তো, এ বেচারার ভাগ্যে কি কিছুই জুটবে না!' এই বলে আবার মুনীশ্বরকে ডাকলেন। মুনীশ্বর এল। মুনীশ্বর বারান্দায় দাঁড়িয়ে শুনতে পেয়েছিল বড়োবাবু আমাকে কি বলছিলেন। মুনীশ্বর বড়োবাবুর ভক্ত ভৃত্য হিসাবে তাঁর হাঁকডাকের কখন কী উদ্দেশ্য তা সে ভালো করেই বুঝে নিয়েছিল। সে ঘরে ঢুকেই, বড়োবাবু তাকে কিছু বলবার আগেই কোথা থেকে একটা জিঞ্জার বিস্কুট এনে বড়োবাবুর হাতে দিল। তিনি বিস্কুট পেয়ে মহা খুশি। বিস্কুটটি কুকুরটিকে খেতে দিলেন। তার পরেই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখলে, মুনীশ্বর কেমন অন্তর্যামী! এইজন্যেই তো ও না হলে আমার চলে না। ও বকুনি খায় অথচ আমার কাজে একটুও ত্রুটি করে না। ও আমার মেজাজ ভালো করেই বুঝে নিয়েছে।

আমিও যেমন ওকে বকি ও কিন্তু মাঝে মাঝে আমাকেও বেশ মোলায়েম ভাবে গৌণভাবে বকে। ও ভাবে ওর কথার মানে আমি বুঝতে পারি না। আমি কিন্তু ঠিকই বুঝি, কিন্তু প্রতিবাদ করি না; কারণ, বুঝি ও যা বলে ঠিকই বলে, কিছু অন্যায় বলে না। এই দেখ-না কালকে কি একটা কাজে গোষ্ঠকে একটা চিরকুট লিখে শাস্ত্রীর কাছে পাঠিয়েছিলাম, আর বোধ হয় তার কিছুক্ষণ পরেই মুনীশ্বরকে পাঠিয়েছিলাম দ্বিপুর কাছে আমার কাগজ এল কিনা জানতে, তার কিছুক্ষণ পরেই আমার কি একটা দরকারে— হ্যাঁ মনে পড়েছে, একটা রুমাল দেবার জন্যে মুনীশ্বরকে ডাক দিলাম, কোথায় বা মুনীশ্বর আর কোথায় বা গোষ্ঠ। আমি তো ভারি বিরক্ত হলাম, ভাবলাম, আমার একি অবস্থা হল। কাছেপিঠে কেউই নেই। আমার হৈ-চৈ শুনে দৌড়ে এল অনিল মিত্র, সে এসে আর কি করবে, সে কি আর জানে আমার কোন্ জিনিস কোথায় থাকে। সে এসে চুপ করে দাঁড়াল, তাকেও এক ধমক দিয়ে বললাম, তুমি এলে কেন? তোমাকে তো ডাকি নি। যাও, তুমি নিজের কাজ করো গিয়ে। সে বেচারা চুপ করে চলে গেল। আমিও চুপ করে বসে রইলাম। মনে মনে ভাবলাম মুনীশ্বরের দেখা একবার পেলে হয়।' তাঁর কথা শেষ হতেই আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তারপর কি হল?' তিনি বললেন, 'হবে আর কি, কিছুক্ষণ পরে মুনীশ্বর এল, সে আসতেই তাকে তো একচোট বকুনি দিলাম। সে শান্তভাবে বললে, আর একজন বেশি লোক রাখা দরকার। যদিও আর-একজন লোক রাখার দরকার নেই— যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আমারই মনে রাখা কখন কাকে কি কাজের জন্যে কোথায় পাঠাই। আমি যে একসঙ্গেই মুনীশ্বর আর গোষ্ঠকে পাঠিয়েছিলাম সে খেয়ালই আমার ছিল না। এই কথাটা মুনীশ্বর বেশ ইনিয়ে-বিনিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিলে, বেশ একটু অভিমানের স্বরে। কি আর করি, মুনীশ্বরের বকুনি হজম করতেই হল।' এই বলে বড়োবাবু নিজের কথাতেই নিজে হাসলেন। সে এক অপূর্ব হাসি।

আর-একদিনের ঘটনা— শাস্ত্রীমশায়ের কাছ থেকে একটা চিরকুট নিয়ে বড়োবাবুকে দিতে গিয়েছিলাম। চিরকুটে কি লেখা ছিল আমি দেখি নি। চিরকুটটি ভাঁজ করা ছিল। বড়োবাবু তখন কি একটা বিষয় বই পড়ছিলেন। চিরকুটটি তাঁর হাতে দিতেই তিনি চিরকুটটি খুলে পড়লেন, পড়েই বললেন, 'এ জবাবে আমি সন্তুষ্ট নই।' এই বলে সঙ্গে সঙ্গেই একটা চিরকুটে দু-চার লাইন কি লিখলেন, লিখে সেটি মোড়ক করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'এক্ষুনি এটা শাস্ত্রীকে গিয়ে দাও।' আমি চিরকুটটি নিয়ে ঘর থেকে বেরতে যাচ্ছি এমন সময় একজন সাঁওতাল হঠাৎ দরজার সামনে এসে তাঁকে দু-হাত জোড় করে নমস্কার করলে, বললে, 'তোকে দেখতে এসেছি, তুই তো বড়ো বাবা, আমাদের গাঁয়ের মোড়লদের কাছে শুনেছি তুই তো আমাদের গ্রামে যেতিস, আমাদের পরব দেখতিস, তোর খুব ভালো লাগত, আর তো যাস না, বড়ো হয়েছিস, কেমুন করে আর যাবি, তাই তোকে দেখতে এসেছি, তোকে দেখতে খুব ভালো লাগছে। তুই তো এখন আর যাস না, তোদের ছেলে-বাবুরা (আশ্রমের কয়েকজন ছাত্র) আর পিয়ার সাহেব (পিয়ার্সন) যায়।' এই কথা বলে সে আর-একবার বড়োবাবুকে নমস্কার করে চলে যাবার উপক্রম করছে দেখে বড়োবাবু তাকে বললেন, 'দাঁড়াও, আজকাল তোমাদের নাচ গান পরব আগের মতো হয় তো?' সে বললে, 'খুব হয়।' তারপরেই বড়োবাবু বললেন, 'বেশ, নাচ গান খুব করিস, তুই বাঁশি বাজাস?' সে বললে, 'যখন জোয়ান ছিলাম খুব বাঁশি বাজাতাম, এখন আর বাজাই না।' সে বারান্দায় বেরিয়ে চলে যাচ্ছে এমন সময় বড়োবাবু বললেন, 'ওকে একটা টাকা দিয়ে দাও। আগে ওদের পাড়ায় গিয়ে নাচ গান দেখতাম, গল্পসল্প করতাম, মাঝে মাঝে বক্‌শিশও দিতাম, ওরা কত খুশি হত। দাও, ওকে একটা টাকা দিয়ে দাও। ও বেচারা খুশি হবে। ও তো আর জানে না, ওদের দু-একজন মোড়লদের সঙ্গে আমার কেমন বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল, কেমন প্রাণ খুলে তাদের সব ঘরোয়া কথা আমাকে

বলত। জান কি? ওরা পরবের সময় একটু টানে, সেই টানের ঝোঁকে কত মজার কথাই বলে, আজ সেই-সব কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। ওরা কত সরল। আমি মাঝে মাঝে ওদের টাকা বক্‌শিশ দিতাম, কিন্তু তারা কখনো হাত পেতে ভিক্ষুকের মতো আমার কাছে টাকা চায় নি। ওদের ভিক্ষাবৃত্তি নেই, ওরা সরল সাদাসিধে। যাও, আর দেরি কোরো না, ওকে টাকা দিয়ে দাও।' তাঁর কথা শুনে আমি সাঁওতাল মাঝিকে দাঁড়াতে বললাম, সে দাঁড়াল। আমি তো একটু দুশ্চিন্তায় পড়লাম; ভাবলাম একি কাণ্ড, বড়োবাবু কি মনে করেছেন আমি পকেটে টাকা নিয়ে বেড়াই। তাঁকে বললাম, 'টাকা তো এখন আমার কাছে নেই, দেখি অনিলের কাছে যদি টাকা থাকে, সে তো আপনার হাতখরচের টাকা তার কাছে রাখে।' আমার কথা শোনামাত্র তিনি বিরাট অট্টহাসি হেসে বললেন, 'এই যাঃ, আমি ভাবছিলাম টাকা দেবার কথা যেন অনিলকেই বলছি। দেখ দেখি, কি কাণ্ড! যাও যাও, অনিলের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ওকে দিয়ে দাও।' আমাকে আর অনিলের কাছে যেতে হল না, কি কাজে অনিল তখন দেখলাম বড়োবাবুর কাছে আসছে। আমি তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে সাঁওতালটিকে দিলাম। সাঁওতালটি হাতে নিয়ে বললে, 'এ টাকা কেন দিচ্ছিস?' আমি বললাম, 'বুড়োবাবা খুশি হয়ে তোমাকে এই টাকা দিয়েছেন।' সে আমার দিকে চেয়ে অবাক হয়ে রইল। তারপর বললে, 'আমি তো টাকা চাই নি, বুড়োবাবাকে দেখতে এসেছিলাম।' তার কথা শুনে আমি বললাম, 'বড়োবাবু তো তোদের বন্ধু, তোদের বাবার মতন। বাবা ছেলেকে যেমন টাকা দেয় তেমনি করে বুড়োবাবা ভালোবেসে তোকে দিয়েছেন।'

বুড়োবাবা ভালোবেসে টাকা দিয়েছেন শুনে সেই সাঁওতাল ভাইটি চলে গেল। যাবার সময় ভক্তিভরা কণ্ঠে বলে গেল— 'বুড়োবাবাকে দেখে খুব আনন্দ হল। বুড়োবাবা আমাদের কত ভালোবাসেন।' একটু পরেই মুনীশ্বর এল। তাকে জিজ্ঞেস করলাম বড়োবাবু যখন একসময় সাঁওতাল পল্লীতে যেতেন, সাঁওতালদের

সঙ্গে মিশতেন, তাদের সঙ্গে গল্পসল্প করতেন, তুমিও কি তখন বড়োবাবুর সঙ্গে যেতে?' মুনীশ্বর বললে, 'আমি তাঁর সঙ্গে যেতাম না কিন্তু খোঁজখবর রাখতাম কোন্ কোন্ দিন যেতেন আর কখন ফিরতেন। একদিন আমাকে বললেন— বড়ো মুশকিলে পড়েছি, আমাকে চারটি টাকা ধার দিতে পার, আমি কালকে সাঁওতাল-দের বলে এসেছিলাম তাদের চারটি টাকা দেব। আমি বড়োবাবুকে চারটি টাকা দিলাম, কিন্তু এ-কথা আর কাউকে বললাম না। কিছু-দিন পরে কুঞ্জবাবু যখন এলেন বড়োবাবু তাঁর কাছ থেকে চারটি টাকা চেয়ে নিয়ে আমাকে দিলেন। কুঞ্জবাবু প্রত্যেক মাসেই আসতেন কলকাতা থেকে মাসোহারার টাকা নিয়ে। আর, কি কি বাবদ কাকে কাকে কত টাকা দিতে হবে তার একটা হিসেব খাতায় লিখে নিয়ে আসতেন। সেই হিসেবে লেখা থাকত সংসারখরচ বাবদ দ্বিপুবাবুর হাতে কত টাকা দিতে হবে, বড়োমাকে হাতখরচ কত দিতে হবে, দিনুবাবুকে কত মাসোহারা দিতে হবে, দিনুবাবুর স্ত্রী কমলা বৌমাকে কত হাতখরচ দিতে হবে আর আমাদের কাকে কাকে কত দিতে হবে। এই হিসেবের খাতায় বড়োবাবুকে নাম সই করে দিতে হত। কুঞ্জবাবু যখনই বড়োবাবুকে হিসেবের খুঁটিনাটি বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করতেন, বড়োবাবু খুব বিরক্ত হয়ে যেতেন, বলতেন, ও-সব খুঁটিনাটি বোঝবার আমার সময় নেই, আমার ভাগে কত পড়েছে তাই বলো। বড়োবাবুর কথা শুনে কুঞ্জবাবু বলতেন, এ টাকা তো সবই আপনার ভাগের, আপনিই তো কার কার ভাগে কি কি পড়বে বরাদ্দ করে দিয়েছেন, ইত্যাদি। বড়োবাবু তখন বলতেন, 'আচ্ছা বেশ হয়েছে, যাও দ্বিপুকে গিয়ে সব বুঝিয়ে দাও। আমাকে কোথায় নামসই করতে হবে বলো, করে দিচ্ছি। তার পরেই কুঞ্জবাবু যেখানে যেখানে সই করতে বলতেন বড়োবাবু সেইমতো নামসই করে দিতেন।'

আমিও কতবার দেখেছি কুঞ্জবাবুকে মাসোহারা নিয়ে আসতে। একবার কুঞ্জবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'এখানে বড়োবাবুর সংসারে

যা-কিছু খরচপত্র হয় সে-সব তো দ্বিপুবাবু আর বড়োমাই দেখেন আর খরচও তো হয় তাঁদের হাত দিয়ে, তা হলে খামকা কেন বড়োবাবুর কাছে হিসেবপত্র নিয়ে বসেন।' উত্তরে কুঞ্জবাবু বললেন, 'এটা আমাদের সেরেস্তার নিয়ম, যিনি বড়ো কর্তা তিনি ভালো করে এই হিসেবপত্র দেখুন আর না-দেখুন আমাদের হিসেব দেখাতেই হবে তাঁকে। এই নিয়ম এখনকার নিয়ম নয়, এ নিয়ম মহর্ষিদেবের আমল থেকে চলে আসছে। কলকাতায় যখন মহর্ষিদেবের বিরাট সংসারে বড়োবাবু, মেজবাবু এই-সব ভাইরা একসঙ্গে ছিলেন তখনো জমিদারির থেকে সদর নায়েব মাসে মাসে মাসোহারার টাকা এনে তার খুঁটিনাটি সব হিসেবপত্র মহর্ষির কাছে দিতেন। মহর্ষি কিন্তু বড়োবাবুর মতন এরকম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হিসেব দেখতেন না, সব-কিছু খুঁটিয়ে দেখতেন এবং যথারীতি মাসোহারার হিসেবের খাতায় সই করতেন। তখনো এইরকম নিয়মে বরাদ্দ ছিল— হাত-খরচা বাবদ তাঁর ছেলেরা কে কত পাবেন, সংসারে বা সর্বসাকুল্যে কোন্ মাসে কত খরচ হল তারও হিসেব মহর্ষির কাছে দাখিল করতে হত। মহর্ষিদেব বুড়ো হয়ে যখন ভালো করে সব-কিছু দেখতে শুনতে পারতেন না তখনো কিন্তু এক-এক সময় কোনো কোনো বিষয়ে আগাগোড়া সব খুঁটিনাটি জিজ্ঞেস করতেন। আর এমনিই তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল যে সেই খুঁটিনাটিতে কোথাও কিছু গলদ থাকলে অমনি ধরে ফেলতেন। একটা গল্প বলি : গল্পটা শুনেছি যদুবাবুর কাছে, যদুবাবু তখন ছিলেন কলকাতার সদর এস্টেটের একজন প্রধান কর্মচারী। একবার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে কোনো একটা অনুষ্ঠান উপলক্ষে অনেক নিমন্ত্রিত ব্যক্তির মধ্যাহ্নভোজনের ব্যাপার, এই ব্যাপারটা ছিল সামাজিক ধরনের। যদুবাবুর উপর ভার পড়েছিল কারা কারা নিমন্ত্রিত হবেন তাঁদের নামের ফর্দ লিখে সেটা মহর্ষিদেবকে দেখানো এবং সেইসঙ্গে কি কি ভোজ্য হবে তার পদের একটা তালিকাও লিখে জানানো। সেই অনুসারে যদুবাবু ফর্দ তৈরি করে নিয়ে মহর্ষিদেবের কাছে উপস্থিত হলেন।

মহর্ষিদেব তাঁকে বললেন 'পড়ে শোনাও'। যদুবাবু প্রথমেই নিমন্ত্রিতদের নামের ফর্দ পড়ে শোনালেন। মহর্ষিদেব খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলেন, শুনে বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে একটা নাম বাদ পড়ে গেছে, তুমি আবার ভালো করে পড়ো।' যদুবাবু আবার ফর্দটা ভালো করে পড়ে শোনালেন। এইবার মহর্ষিদেব বললেন, 'ঠিক ধরেছি, একটা নাম বাদ পড়ে গেছে।' মহর্ষিদেবের কথা শুনে যদুবাবু কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারছিলেন না কার নাম বাদ পড়ে গেছে। ভয়ে ভয়ে বললেন 'কর্তা, আমি তো মনে করতে পারছি না কার নাম বাদ পড়ে গেছে।' মহর্ষিদেব এমনিতে খুব রাশভারী আর গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন, কিন্তু পরিহাসরসিকও ছিলেন। যদুবাবুর কথা শুনে মৃদু হাসি হেসে বললেন 'তুমি ঠিক জানো কার নাম বাদ পড়েছে। ভালো করে ভেবে দেখ।' যদুবাবু আবার বললেন 'আমার তো কিছুতেই মনে পড়ছে না।' কর্তা তখন বললেন, 'এ কি রকম ব্যাপার! তোমার নামটাই ভুলে গেলে!' কর্তার কথা শুনে যদুবাবু বললেন, 'আমরা তো আছিই, আমরা তো ঘরের লোক।' এই কথা শুনে কর্তা বলেছিলেন, 'এ-সব ব্যাপারে মুনিব-কর্মচারীর সম্বন্ধকে টেনে এনো না, সামাজিক রীতি-নীতির দিকটা ভুলে যেয়ো না।' তার পরেই খাবারের ফর্দ তাঁকে পড়ে শোনানো হল, সেই ফর্দেও কর্তা ত্রুটি বের করলেন। ত্রুটি বিশেষ কিছুই নয়, একটা বিশেষ কি শাকের নাম ফর্দে ছিল না। কর্তা বললেন, 'এই শাক কি আজকাল আর পাওয়া যায় না?' যদুবাবু বললেন 'পাওয়া যায়।' যদুবাবুর কথা শুনে কর্তা বললেন 'যদি পাওয়া যায় তা হলে ফর্দে কেন সেটা লেখা হয় নি? এটা লিখে নাও।' '

এর পর একবার কলকাতায় যদুবাবুকে দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সদর সেরেস্তার আপিসেই। তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কুঞ্জবাবুর এই গল্পের কথা— তিনি বলেছিলেন, 'কুঞ্জবাবু আপনাকে যা বলেছিলেন সবই ঠিক। বাড়িতে

কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে যা যা করণীয় তা যথাসাধ্য সব ঠিকভাবেই করতে হত, কোথাও কোনো ত্রুটি না হয় সেদিকে কর্তার কড়া নজর ছিল। ছেলেমেয়েদের বেশভূষায় কোনোরকম অপরিপাট্য তিনি দেখতে পারতেন না। তিনি সমাজ-সংস্কারপন্থী হলেও অনেক বিষয়ে সেকেলে হিন্দু পরিবারের সামাজিক রীতিনীতি মেনে চলার পক্ষপাতী ছিলেন ; তাঁর ছেলেমেয়েরা কিছু কিছু আধুনিক চালচলন অবলম্বন করলেও তিনি সেটা খুব যে পছন্দ করতেন তা নয়। আপনি শুনেছেন কি যে একসময় এই বাড়িতে রেওয়াজ ছিল বাড়ির বউ-ঝিরা যাতে নিজের পছন্দমতো শাড়ি, গহনা ইত্যাদি কিনতে পারেন সেজন্যে বাড়িতে এসেই দোকানদারদের একটা বড়ো ঘরে ঐ-সব জিনিস এনে কতকটা দোকান সাজিয়ে বসতেন, তার পর বউ-ঝিরা সেই-সব দেখে যা পছন্দ হত কিনতেন, আর যা পেতেন না তারও ফরমাশ করতেন, সেই ফরমাশ-মতো দোকানদাররা জিনিসপত্র নিয়ে আসতেন। এ-সব তো এখন আপনাদের কাছে গল্প-কাহিনীর মতো মনে হবে, কিন্তু এই-সব ব্যাপার একদিন এই বাড়িতেই ঘটেছে।'

মহর্ষিদেব যে সমাজসংস্কারক হয়েও বেশ কতকটা সেকেলে রক্ষণশীল মনোভাব পোষণ করতেন তার প্রভাব অনেকটা যে বড়োবাবুর উপরে পড়েছিল সেটা শুধু বড়োবাবুর সঙ্গে মিশেই টের পেয়েছিলাম তা নয়, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও মিশে টের পেয়েছিলাম ভালো করেই। তার কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি—

বেশ মনে পড়ে একবার আমি, সবে তখন চশমা ব্যবহার করছি, রবীন্দ্রনাথের ঘরে ঢোকামাত্র আমার দিকে মিনিটখানেক এমনভাবে তাকিয়ে ছিলেন যেন আমি একজন অপরিচিত লোক। তার পর সহজভাবেই আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন— কে আমার চোখ পরীক্ষা করেছিলেন আর কেই বা আমাকে চশমা দিয়েছিলেন। তাঁর প্রশ্নের জবাব শুনে তিনি বললেন, যাঁরা আমাকে চশমা দিয়েছেন, তাঁর ধন্যবাদ তাঁদের জানাতে এইজন্যে যে, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের পরিহাস অনুযায়ী, আমার চোখে পর্দা দিয়েছিলেন, অর্থাৎ একজন

চক্ষুলজ্জাহীন মানুষের চোখে একজোড়া কাচের পর্দা দিয়েছিলেন। তার পরে আবার চশমা প্রসঙ্গে বললেন, 'আমিও একদিন চশমা প'রে বাবামশায়ের কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম, তার পর যখন বাবামশায়ের কাছ থেকে চলে আসবার উপক্রম করছি তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন যে আমার চোখ কি খুব খারাপ হয়েছে। যখন জানলেন যে তেমন কিছুই নয়, তিনি বলেছিলেন যে তিনি ভেবেছিলেন আমি বিনা চশমায় হয়তো বাবাকেও দেখতে পাই না।' এর পর রবীন্দ্রনাথ সহজে চশমা প'রে মহর্ষির কাছে যেতেন না। কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে মহর্ষি চশমা প'রে তাঁর ঘরে ঢোকাটা ঠিক ভব্যতা নয় মনে করেছিলেন।

তখনকার দিনে সেকেলে বৃদ্ধদের কাছে যুবকদের নাকে চশমা, মুখে সিগারেট, পরনে কোট-প্যান্ট বড়োই বিসদৃশ ঠেকত, তাঁরা এ-সব জিনিসকে 'হাল ফ্যাশন' বলে বিরক্তির দৃষ্টিতে দেখতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথও এই সংস্কার থেকে মুক্ত ছিলেন না। তিনিও হ্যাট-কোট-ধারী সাহেবি ঢঙে বাঙালীদের ইংরেজিয়ানা চালচলন পছন্দ করতেন না। পছন্দ না করলেও জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেও কিছু কিছু ইংরেজিয়ানা ঢুকে পড়েছিল। কবিতায়, ছড়ায় ইংরেজি-য়ানার বিরুদ্ধে ঠেস দিতে ছাড়তেন না। এক-এক সময় তীব্র-ভাবেই তিনি ইংরেজি পোশাক-পরিচ্ছদ পরার বিরুদ্ধে অসহিষ্ণু হয়ে তীব্র মত প্রকাশ করতেন। একবার কি-একটা সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে অরুণেন্দ্রনাথ সাহেবী পোশাক প'রে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন এমন সময় বড়োবাবুর নজর হঠাৎ সেই দিকে পড়ল। নজর পড়তেই চেঁচিয়ে তিরস্কারের স্বরে বলেছিলেন 'এই অভব্য বেশে কোথায় যাচ্ছিস?' যারা কাছাকাছি ছিল তারা সকলেই ভয় পেয়ে গেল। অরুণেন্দ্রনাথও ঐ বকুনি খেয়ে চট্ করে বাড়ির ভিতরে গা-ঢাকা দিলেন। এই গল্পটা শুনেছিলাম ইন্দিরাদেবীর কাছে, রবীন্দ্রনাথের কাছে এবং স্বয়ং বড়োবাবুর কাছেও। এই গল্প প্রসঙ্গেই বড়োবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম— সাহেবদের পোশাক-

পরিচ্ছদটা কি অভব্য ? উত্তরে তিনি বলেছিলেন 'মোটেই অভব্য নয়, ওটা ওদের জাতীয় পোশাক, ওদের সামাজিক পরিবেশে বেখাপ নয়, মানান-সই কিন্তু বাঙালীদের সামাজিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে— যেমন বিবাহ-অনুষ্ঠানে বাঙালীর অঙ্গে সাহেবী পোশাক আমার তো বড়োই অশোভন লাগে। আমরা তো বাড়িতে প্রায় সর্বক্ষণ ইজের পাঞ্জাবী প'রে থাকি কিন্তু সামাজিক কোনো অনুষ্ঠানে যেতাম রীতিমতো ধুতি, চাদর, পাঞ্জাবী প'রে, খাঁটি বাঙালী বেশভূষায়। কবি তো খুব আধুনিক, কিন্তু কখনো কি তাঁকে মন্দিরে, সামাজিক ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠানে ইজের, পাঞ্জাবী, জোব্বা, চাপকান প'রে যেতে দেখেছ। রবি এ বিষয়ে খাঁটি বাঙালী।' তাঁর কথা শুনে বললাম, 'হ্যাঁ, মন্দিরে কিংবা বিবাহাদি কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে গুরুদেবকে কখনো ইজের জোব্বা চাপকান প'রে যেতে দেখি নি। আমার ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে তিনিই আমার ছেলের মুখে অন্ন দিয়েছিলেন, সেই অনুষ্ঠানে তাঁকে খাঁটি বাঙালী বেশভূষাতেই দেখেছিলাম। সেই অনুষ্ঠানে ক্ষিতিমোহন-বাবু, শাস্ত্রীমশায় ইত্যাদি কয়েকজন মাস্টারমশায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সকলেই দেশীয় পোশাক-পরিচ্ছদ পরেছিলেন।' আমার কথা শুনে বড়োবাবু বললেন, 'ক্ষিতিবাবু, শাস্ত্রীমশায়, রবি এঁদের সকলেরই এই আভিজাত্য আছে। এই আভিজাত্যটাই আমি পছন্দ করি। কেন পছন্দ করি এ নিয়ে বাজে তর্ক কোরো না আমার সঙ্গে। সাহেবিয়ানা পছন্দ করি না। তোমার কি কখনো হ্যাট-কোট পরবার শখ হয় নাকি ?' আমি বললাম, 'দু-একবার শখ করে প'রে দেখেছি, কিন্তু ধুতি-চাদর প'রে যেমন আরাম পাই, কোট-প্যান্ট প'রে তেমন আরাম তো পাইই না, বরং মনে হয় কোট-প্যান্ট ছেড়ে ধুতি-পাঞ্জাবী পরলেই বাঁচি, এইজন্যেই ঐ শখটা দু-একবার করেই ছেড়ে দিয়েছি।' আমার কথা শুনেই বড়োবাবু বেশ একচোট হেসে বললেন, 'তা হলে দেখছি তুমি আমার দলের।' এই সময় হঠাৎ ধুতি-পরিহিত অ্যাণ্ড্রুজ সাহেবকে দেখেই তিনি

আমাকে বললেন, 'আর বিশ্লেষণ করে বলবার দরকার নেই। এইবার সরে পড়ো। এইবার অ্যাণ্ড্রুজের সঙ্গে গল্প করব।'

ইতিপূর্বেই বলেছি বড়োবাবুর অনেক সময় খেয়াল থাকত না কখন কার সঙ্গে কথা বলছেন এবং যাঁর সঙ্গে কথা বলছেন সে ব্যক্তিটি কে। এমনিভাবেই একবার শান্তিনিকেতনের শিক্ষক জিয়াউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে নানারকম খোশগল্প করতে করতে কথা প্রসঙ্গে কি একটা হিন্দুশাস্ত্রের বচন বলেছিলেন, সেই বচন শুনে জিয়াউদ্দিন সাহেব বলেছিলেন 'আমাদের শাস্ত্রেও এইরকম কথা আছে।' জিয়াউদ্দিন সাহেবের কথা শুনে বড়োবাবু জিয়াউদ্দিনের দিকে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাদের শাস্ত্র মানে?' উত্তরে জিয়াউদ্দিন সাহেব বললেন, 'মুসলমান শাস্ত্রে।' জিয়াউদ্দিন সাহেবের কথা শুনে তিনি বললেন, 'তুমি মুসলমান, এ-কথা তো আমাকে কোনোদিন বল নি।' জিয়াউদ্দিন সাহেব বললেন, 'আমি তো আপনার কাছে সময় সুযোগ পেলেই আসি, আপনি আমার সঙ্গে কত স্নেহভরে কথা বলেন, 'এসো জিয়াউদ্দিন' বলেন, তবু আপনি কেন মনে করলেন যে আমি মুসলমান নই।' তখন বড়োবাবু বেশ একচোট হেসে বললেন, 'দেখ দেখি আমার কাণ্ড!' এই বলে আবার জিয়াউদ্দিনের সঙ্গে গল্প শুরু করলেন। জিয়াউদ্দিন সম্বন্ধে এই গল্পটি আমি শুনেছি শান্তিনিকেতনের কলাভবনের স্বনামধন্য চিত্রশিল্পী শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কাছে। জিয়াউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে বিনোদের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। জিয়াউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে আমারও বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তিনি ছিলেন বিনয়ী, সদালাপী, বন্ধুবৎসল; আশ্রমের সকলেই তাঁকে খুবই প্রীতির চোখে দেখতেন। তাঁর স্ত্রীও ছিলেন স্বামীর মতো সদালাপী, সরল সাদাসিধে মহিলা।

এই বিনোদবাবুর সঙ্গেই একদিন বড়োবাবুর বিষয় গল্প প্রসঙ্গে তাঁকে বলেছিলাম সাঁওতাল ভাইরা কাপড়ে চোপড়ে, টাকায় পয়সায় দরিদ্র হলেও তাদের মন দরিদ্র নয়, তারা পয়সার জন্যে ভিক্ষুকের



ান্তিনিকেতন নিচুবাংলায় দ্বিজেন্দ্রনাথ

মতন কারো কাছে হাত পাতে না, তাদের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যেই বড়োবাবু তাদের খুবই প্রীতি এবং শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। বিনোদবাবু আমার এই কথা শুনে বললেন, 'হ্যাঁ, বড়োবাবুর কথা ঠিক। আমি একবার একটি ছোট্ট পাঁচ-ছয় বছরের সাঁওতাল মেয়েকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একটা পয়সা দিয়ে বলেছিলাম, 'মিষ্টি কিনে খাস।' সে ঐ পয়সা নিয়ে তার মাকে দিয়েছিল। তার মা আমার কাছে এসে বললে 'এই পয়সা আমার মেয়েকে কেন দিলি? সে কি তোর কাছে পয়সা চেয়েছিল?' মেয়েটির মায়ের এই কথা শুনে আমি বললাম— ও চায় নি, আমি ইচ্ছে করেই ওকে দিয়েছিলাম মিষ্টি কিনে খেতে। আমার কথা শুনে মেয়েটির মা বললে 'ও রকম করে ওকে পয়সা দিস না, যদি তোর মিষ্টি খাওয়াতে ইচ্ছে করে তো নিজে হাতে ওকে মিষ্টি দিস।' এই বলে সে চলে গেল। এই কথা আমি আজও ভুলতে পারি নি।'

বড়োবাবু, যারা ওঁর কাছে যখন-তখন যাওয়া-আসা করত তাদের সঙ্গে গল্পসল্প করতেন। কিন্তু কি জানি কেন, তিনি নিরিবিলিতে নিচুবাংলায় নিজের ঘরে একা থাকতেন বলেই হোক, কিংবা সময় সময় গম্ভীর হয়ে তন্ময় হয়ে লেখাপড়া করছেন বলেই হোক, অনেকেই তাঁকে সকৌতূহল দৃষ্টিতে দূরের থেকেই দেখত, কাছে যেতে যথেষ্ট সংকোচ বোধ করত। এমন-কি আমাদের বর্তমান জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও বড়োবাবুকে বহু-বার দূর থেকে দেখেছিলেন, সাহস করে কাছে গিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন নি। সুনীতিবাবুর একটি চিঠিতে বড়োবাবু সম্বন্ধে তিনি আমাকে লিখেছেন: "শান্তিনিকেতনে দ্বিজেন্দ্রনাথকে বহুবার দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে বিশেষ আলাপ বা আলোচনার সুযোগ লইতে সাহসী হই নাই।··· দেখিয়াছি তিনি তাঁহার বাড়ির বারান্দায় বসিয়া আছেন, হাতে পাখি আসিয়া বসিয়াছে, তাঁহাদের খাওয়াইতেছেন— তখন সেখানে গিয়া হাজির হইয়া পাখি তাড়াইয়া দিবার প্রবৃত্তি হয় নাই।"

সুনীতিবাবুর পত্র থেকেই জানতে পেরেছি যে একবার বিশেষ একটি কারণে তিনি বড়োবাবুর কাছে উপস্থিত হবার এবং কিছু আলোচনা করবার সুযোগ নিয়েছিলেন। সেই সুযোগ নেওয়াও কতকাংশে কিংবা বহুলাংশে সার্থক হয়েছিল। স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রে জাতীয় পতাকা কেমন হবে, তার রঙই বা কেমন হবে এই বিষয়ের একটা কল্পনা নিয়ে তিনি বড়োবাবুর কি মত জানতে চেয়েছিলেন ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে। শান্তিনিকেতনে কয়েকজনের সঙ্গে সুনীতিবাবুর এ বিষয় আলাপ করেছিলেন, আলাপ করে তাঁরা ঠিক করেন যে এ বিষয় মহাত্মাজীকে শান্তিনিকেতন থেকে একটা চিঠি পাঠানো হোক। পতাকায় তিনটি রঙ থাকবে— গেরুয়া, সাদা ও সবুজ— 'গেরু, ধৌলা, হরা'— এই তিন রঙে আমাদের ভারতীয় 'তিরঙ্গা ঝাণ্ডা' যেন কায়েম হয়। 'শাদা' হবে সত্য এবং পবিত্রতার প্রতীক। 'সবুজ' হবে জীবনের, এবং গেরুয়া রঙ হবে ত্যাগের প্রতীক। দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ করে তাঁর সমর্থনকে শিরোভূষণ করে ঐ পত্রের তলদেশে প্রথম তাঁরই স্বাক্ষর পড়েছিল, তার পর আরো কয়জন সেই চিঠিতে নামসই করেছিলেন। এই চিঠির বক্তব্য বিষয়ে অ্যাণ্ড্রুজ সাহেবের সমর্থন ছিল। বোধ হয় অ্যাণ্ড্রুজ সাহেব এ বিষয় বড়োবাবুর সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। অ্যাণ্ড্রুজ সাহেবের মারফতেই এই চিঠিটা মহাত্মাজীকে দেওয়া হয়। এই চিঠিটা গান্ধীজীর সাপ্তাহিক ইংরাজি পত্র *Young India*-তে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে বহু আলোচনার পর স্থির হয় যে ঐ পতাকার তিন রঙের নাম হবে যথাক্রমে— 'জাফরান, সফেদ, সব্জ'। এই চিঠির বক্তব্য বিষয় বড়োবাবুর সমর্থন আশীর্বাদ পেয়ে সুনীতিবাবুই চিঠির ভাষা লেখেন এবং ঐ চিঠির নীচে বড়োবাবুর স্বহস্তে লেখা নাম স্বাক্ষর পাবার পর আরো কয়েক জনের স্বাক্ষর নিয়ে ঐ চিঠি মহাত্মাজীর কাছে পাঠানো হয়েছিল। ঐ সময় বোধ হয় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর কিংবা ডিসেম্বরে মহাত্মাজী কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে ধারওয়ারে

ছিলেন, কংগ্রেসের ঐ অধিবেশনে সভানেত্রী ছিলেন স্বনামধন্যা সরোজিনী নাইডু। যাতে কংগ্রেসের ঐ অধিবেশনের সময়েই জাতীয় পতাকা কেমন হবে আলোচনা করে স্থির হয় সেই উদ্দেশ্যেই শান্তিনিকেতন থেকেই মহাত্মাজীকে চিঠি পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক তখন অর্থাৎ ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে 'তিরঙ্গা পতাকা' কিছু স্থির হয় নি। তার পর ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে 'তিরঙ্গা পতাকা' জাতীয় পতাকা হওয়া স্থির হয়।

বড়োবাবুর মন ছিল শিশুর মতন সরল এবং কোমল। তাঁর এই স্বভাবের জন্যে যখনই কেউ কোনোরকম আর্থিক সাহায্য চাইবার জন্য উপস্থিত হতেন তিনি তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে একটুও দ্বিধা করতেন না— অল্প হোক, বেশি হোক অর্থ সাহায্য তৎক্ষণাৎ দিতেন। সাহায্যপ্রার্থী সত্যিই-কি সাহায্য পাবার মতন দুরবস্থায় পড়েছে সে সম্বন্ধে খোঁজ নেবার কোনো দরকারই মনে করতেন না। কিন্তু যাঁকে অর্থ সাহায্য করতেন তাঁকে ভিক্ষে দিয়েছেন এই মনোভাব তাঁর ছিল না ; সাহায্য করা দরকার তাই সাহায্য করতেন এবং কাকে কখন কি সাহায্য করেছেন এ-কথাও তাঁর অধিকাংশ ক্ষেত্রে মনে থাকত না। কখনো তাঁর কাছে এ মন্তব্য শুনি নি যে, 'আমি অমুককে সাহায্য করেছি— অমুক আমার কাছে এই চেয়েছিল।' তাঁর সহৃদয় বদান্যতার দুটি ঘটনা বলছি : একবার একজন মধ্যবিত্ত দরিদ্র ব্যক্তি তাঁর চারটি গ্রন্থ নিয়ে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে সেগুলো বিক্রি করে কিছু অর্থ সংগ্রহ করবেন। বইগুলোর মধ্যে একটি উপন্যাস, চারটি বইয়ের সর্বমোট মূল্য ছিল দশ বারো টাকার বেশি নয়। এই লেখক ব্যক্তিটি শুধু যে অর্থকষ্টে পড়েছিলেন তা নয় ভাগ্যদোষে সম্পূর্ণ অন্ধ ছিলেন। শান্তিনিকেতনের সেই সময়কার ছাত্র শিবদাস রায় তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে বইগুলো নিয়ে সোজা বড়োবাবুর কাছে গিয়ে বললেন, 'এই বইগুলো আপনি যদি কিনে পড়েন তা হলে এই অন্ধ ভদ্রলোকটির কিছু উপকার হয়।

বড়োবাবু শিবদাসকে বললেন, 'আমি তো আজকাল নভেল-টভেল পড়ি না। লেখক ভদ্রলোকের অবস্থা কেমন?' শিবদাসব ড়োবাবুকে বললেন, 'তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ।' শিবদাসের কথা শুনে তিনি একটু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'অন্ধ তো এতগুলো বই লিখলেন কেমন করে।' এই বলে বড়োবাবু মুনীশ্বরকে ডাকলেন। মুনীশ্বর আসতেই তার হাতে বইগুলো দিয়ে বললেন, 'নাও, এগুলো রেখে দাও।' তার পরই একটা চিরকুট কাগজে তিনি দ্বিপুবাবুকে লিখলেন, 'দ্বিপু, শিবদাসকে বারোটি টাকা দিও। এই টাকা তোমার কাছে হাওলাত নিচ্ছি, বিকেলে পাঠিয়ে দেব।' শিবদাস সেই চিরকুট নিয়ে দ্বিপু-বাবুর কাছে উপস্থিত হতেই দ্বিপুবাবু তাঁর স্বাভাবিক ভাষায় বললেন, 'বাবামশায়ের বারো টাকা দরকার কিসের জন্যে?' শিবদাস দ্বিপুবাবুকে যখন বললে কেন বারো টাকা চাই, দ্বিপুবাবু সে-কথা শুনে তৎক্ষণাৎ শিবদাসের হাতে বারোটি টাকা দিয়ে দিলেন ঐ গ্রন্থকারটিকে দেবার জন্যে।

এই অর্থসাহায্যের ঘটনাটি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তিনি মানুষের মানমর্যাদা রক্ষার দিকে কত সচেতন ছিলেন। বড়োবাবু বারোটি টাকা লেখকটিকে দিয়েছিলেন ঐ চারিটি গ্রন্থের বিনিময়ে, ঐ গ্রন্থগুলি তাঁর কোনো প্রয়োজনে লাগবে না জেনেই। এমনিতে বারো টাকা দিলে লেখকের মর্যাদা রক্ষা করা হত না, সেটা যেন ভিক্ষে দেওয়ার মতন হত। তাই তিনি যথোচিত মূল্য দিয়েই বইগুলো নিলেন। বইগুলো নিয়ে মুনীশ্বরকে উপহার দিলেন।

আর-একটি ঘটনা: একবার একজন ব্রাহ্মণ নিচুবাংলার বাধা-নিষেধের বেড়া ডিঙিয়ে বড়োবাবুর ঘরের সামনে এসে উপস্থিত। উদ্দেশ্য বড়োবাবুর কাছে কিছু অর্থসাহায্য চাওয়া। বড়োবাবু তখন কী-একটা বিষয় তন্ময় হয়ে লিখছিলেন। ব্রাহ্মণটির প্রার্থনা তাঁর কানেই যাচ্ছিল না, এতই নিবিষ্ট চিত্তে লিখছিলেন। কিছুক্ষণ পরে যখন কলম একটু বিরাম চাইল, উনি কলম রেখে ঘাড় তুলে সামনের দিকে তাকাতেই দেখলেন ঐ ব্রাহ্মণটি হাত জোড় করে

দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করলেন, 'কি চাই?' উত্তরে ব্রাহ্মণটি তাঁর প্রার্থনা বড়োবাবুকে জানালেন। ব্রাহ্মণটির কথা শুনে বললেন, 'তাই বলো, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে কি করে বুঝব।' ব্রাহ্মণটি যখন জানালেন যে তিনি অনেকক্ষণ ধরেই তাঁর প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন, কিন্তু বড়োবাবু নিবিষ্টচিত্তে লিখছিলেন বলে তিনি সে-কথা শুনতে পান নি। তাঁর এই কথা শুনে বড়োবাবু বললেন, 'শুনতে পাই নি! আমি কি ঘুমিয়ে ছিলাম? যথেষ্ট হয়েছে, তুমি আমার সময় নষ্ট কোরো না, অনিলকে ডাকো।' ব্রাহ্মণটি থতমত খেয়ে বললেন, 'আমি তো অনিলবাবুকে চিনি না, তিনি কোথায় থাকেন তাও তো জানি না।' ব্রাহ্মণের কথা শুনে বড়োবাবু বলে উঠলেন, 'এই ব্রাহ্মণটিকে কি বলেছি অনিলকে ডাকতে?— বউমা এতগুলো লোক কেন যে রেখেছেন বুঝতে পারি না। কাজের সময় কাউকেই খুঁজে পাই না— মুনীশ্বর— মুনীশ্বর! এই দেখ-না একজন লোক সাহায্য চাচ্ছেন, তাঁকে সারাক্ষণ এখানে দাঁড় করিয়ে রাখা হল, অনিলকে ডাকো।' অনিলবাবু আসতেই বড়োবাবু বললেন, 'অনিল, এঁকে পাঁচটি টাকা দাও।' বড়োবাবুর কথা শুনে অনিল আস্তে আস্তে ইংরেজিতে বললেন, 'One will do' (একটা টাকা দিলেই হবে)। অনিলের কথা শুনে বড়োবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তোমার বিজ্ঞ বুদ্ধি ছাড়ো, এই ব্রাহ্মণটি যেজন্যে টাকা চাইছেন তা যদি সত্যি না হয় তা হলে আমার ক্ষতি হবে মাত্র পাঁচ টাকা, আর যদি ওঁর কথা সত্যি হয় তা হলে এই সাহায্য না পেলে বিশেষ অসুবিধেয় পড়বেন।' অনিল বড়োবাবুর কথা শুনে আর কি করেন, ব্রাহ্মণকে বললেন, 'চলুন।' বড়োবাবু তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, 'না, না। এইখানেই তুমি টাকা নিয়ে এসো। ওখানে গেলে তুমি ওঁকে এক টাকাতেই বিদায় করবে।' অগত্যা অনিল পাঁচ টাকা এনে ব্রাহ্মণটিকে দিলেন।

বড়োবাবুর দানখয়রাতির এমনি কত গল্প আছে তা আরো অনেকের কাছে শুনেছি। একটা গল্প শুনে অবিশ্বাস্য হলেও কতকটা বিশ্বাসই করেছিলাম বড়োবাবুর প্রকৃতি জেনে। গল্পটি এই:

একবার বড়োবাবু কোনো-একজন বন্ধুর বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছেন—ঘোড়ার গাড়ি দেউড়ির সামনে দাঁড়াল, বড়োবাবু নামতেই একজন ব্রাহ্মণ হাত জোড় করে বড়োবাবুর কাছে কিছু অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করলেন। বড়োবাবু তাঁকে দু-এক টাকা দিয়েই বাড়ির ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছেন, তখন ঐ ব্রাহ্মণটি বললেন, আরো কিছু দিলে বড়ো উপকার হয়। বড়োবাবুর পকেটে তখন আর কিছুই ছিল না, তিনি অসহায় বোধ করে ব্রাহ্মণকে এই বললেন 'আমার কাছে আর কিছু নেই, যদি বিপদে পড়ে থাক তবে এই গাড়ি-ঘোড়া নিয়ে চলে যাও, গাড়ি-ঘোড়া বেচলে অনেক টাকা পাবে।' এই গল্পের সত্যতা যাচাই করবার জন্যে একদিন বড়োবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম 'এই গল্পটা কি ঠিক?' উত্তরে তিনি বললেন, 'গল্পটা ঠিকই, কিন্তু ব্যাপারটা ষোল-আনা ঠিক নয়।' এই বলে যেমন অট্টহাসি হাসেন তেমনি হেসে বললেন, 'তবে ব্যাপারটা শোনো : সেদিন এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে বেশ অনেকক্ষণ আড্ডা দিয়ে বাড়িতে ফিরছি। বাড়িতে এসে গাড়ির থেকে নামছি এমন সময় ঐ ব্রাহ্মণের আবির্ভাব, হাতে টাকা যা ছিল দিয়ে দিলাম, তার কি অভাব, এ-সব জিজ্ঞেস করবার মতো মনোভাব ছিল না। টাকা পেয়েও সে বললে 'আরো কিছু দিলে ভালো হত।' তার কথা শুনে আমি বলেছিলাম, 'আমার কাছে আর কিছু নেই, যাও এই গাড়ি ঘোড়া নিয়ে যাও'—এই বলে আমি বাড়ি ভিতরে চলে গেলাম। বাড়ির ভিতরে গিয়ে একজন কর্মচারীকে বললাম, 'যাও আরো কয়েকটা টাকা ঐ ব্রাহ্মণকে দিয়ে বিদেয় করে দাও।' এই হল আসল ব্যাপার। গাড়ি ঘোড়া দান করাটা এর সঙ্গে কে যে জুড়ে দিয়েছিল জানি না। এই গল্পটা আমিও শুনেছি।'

'আমি অনেক সময় ভুলে যাই কাজের কথা, অন্যমনস্ক হয়ে হয়তো একটা বেহিসাবী কথা বলে ফেলি, একটু বেহিসাবী ছিলামও বটে, তাই বলে একেবারে বেহিসাবী মনে কোরো না। একটু আধটু বেহিসাবী কাজ করা, এটা আমাদের সব ভাইয়েরই

কিছু-না কিছু আছে।' বড়োবাবুর কথা শেষ হতেই, গল্প বেশ জমে উঠেছে ভেবে বললাম—'আপনার সব ভাইরা কে কত বেহিসাবী তা না জানলেও আপনার মেজ ভাই অর্থাৎ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্বন্ধে একটা মজার গল্প শুনেছি গুরুদেবের কাছে।' আমার কথা শুনে তিনি উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'রবি কী মজার গল্প বললে?' আমি বললাম, 'তিনি যখন তাঁর মেজদার কাছে বোম্বাইতে ছিলেন, তখন মেজদা ছিলেন সেখানকার জজসাহেব। মেজদার একটা বড়ো চেস্ট-ড্রয়ার ছিল। একদিন দেখেন, মেজদা যখন গাড়ি করে চলে গেছেন কোর্টে, মেজদার ড্রয়ারের সবকটি খোপই যদিও বন্ধ কিন্তু সবকটিতেই চাবি পরানো আছে। ভাবলেন একি কাণ্ড! বোধ হয় মেজদা চাবিগুলো খুলে যথাস্থানে রাখতে ভুলে গেছেন। মেজদা যখন ফিরে এলেন, তাকে বললেন যে চাবিগুলো চেস্টড্রয়ারের সব দেরাজেই লাগানো ছিল। তিনি একটুও বিস্মিত না হয়ে বললেন, ইচ্ছে করেই ঐ রকম করে রেখেছি, পাছে দরকারের সময় তাড়াতাড়ি দেরাজ খুলতে অসুবিধা হয়। গুরুদেব এই কথা শুনে মনে মনে হাসলেন, ভাবলেন, তা হলে দেরাজে দেরাজে এইরকম ভাবে চাবি লাগিয়ে রাখবার দরকারই বা কি, চাবি না পরিয়ে দেরাজ খুলে রেখে দিলেই তো হয়।' আমার কথা শুনে বড়োবাবু একচোট হেসে বললেন— 'সতুর কাণ্ড! এইরকম কত বিচার-বিবেচনার কাজ সে করত।'

তাঁর কথা শেষ হতেই আমি বললাম—'আপনারাও যেমন, আপনাদের পরম বন্ধু অ্যাণ্ড্রুজ সাহেবও তেমনি। তবে তাঁর বিষয়ে দুটো গল্প বলি শুনুন— একবার তো অ্যাণ্ড্রুজ সাহেব হঠাৎ একদিন রাত্রে আমাকে বললেন—'সুধাকান্ত, তোমার একটা বাড়তি কম্বল থাকে তো আমাকে দাও, আমার একটা আছে, আর একটা চাই, আমি দিল্লী যাব।' তখন শীতকাল, আমার বাড়তি কম্বল না থাকলেও কিছু অসুবিধা ভোগ করেও অ্যাণ্ড্রুজ সাহেবকে একটা কম্বল দিলাম। কম্বলটি নতুন হলেও বেশি দামের ছিল না।

অ্যাণ্ড্রুজ সাহেব কিছুদিন পরে দিল্লী থেকে ফিরে এসে তাঁর বাবুর্চি জহুরীর হাত দিয়ে একটি খবরের কাগজে মোড়ক করে যে কম্বলটি আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, সেটি খুলে দেখেই তো আমার চক্ষুস্থির। কম্বলটি যদিও সামান্য পুরোনো, কিন্তু আমার কম্বলের চেয়ে ঢের বড়ো এবং দামও বোধ হয় অনেক বেশি। কম্বলটি নিয়ে সাহেবের কাছে গিয়ে বললাম, 'সাহেব এ কম্বল তো আমার নয়, এটা তো বেশ দামী কম্বল।' আমার কথা শুনে সাহেব একটুও বিস্মিত না হয়ে দিব্যি সহজভাবে বললেন, 'হ্যাঁ, এ কম্বল তোমার নয় জানি। তোমার কম্বল কোথায় কার বাড়িতে ফেলে এসেছি জানি না— মনে নেই। প্রিন্সিপ্যাল রুদ্র সাহেবের দু-একটা বাড়তি কম্বল ছিল, তাঁর কাছে চেয়ে একটি নিয়ে এসেছি। ভালোই হল তোমার, ভালো কম্বল পেয়ে গেলে।' বড়োমাও আমার কথা শুনে বললেন, 'তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলে যে তিনি রুদ্র সাহেবকে জিজ্ঞেস করে এই কম্বলটি এনেছিলেন, না, তাঁকে ব্যবহার করবার জন্য যে কম্বল দিয়েছিলেন আসবার সময় ভুলে সেই কম্বলটি বিছানার সঙ্গে জড়িয়ে এনেছিলেন! এই দেখ-না কয়েকদিন আগে আমার কাছে একটা বই রেখে গিয়েছিলেন পড়বার জন্যে, তার পর কতবার সাহেব যে আমার কাছে এসেছেন তার ঠিক নেই, একবারও খোঁজ করলেন না বইটা আমার পড়া হয়েছে কিনা। আমারও খেয়াল ছিল না যে বইটা পড়া শেষ করে রেখে দিয়েছি, সাহেবকে দিই নি। শেষটায় মুনীশ্বর আমাকে মনে করিয়ে দিলে যে সাহেবকে বইটা ফেরত দেওয়া হয় নি। তাই সাহেবকে বইটা ফেরত দেওয়া হল। সাহেবের তো কোনো হুঁশ ছিল না।

বড়োবাবু সম্বন্ধে আমার দু-একজন পরম বন্ধুর কাছ থেকে কিছু স্মৃতিকথা আদায় করেছি। যাঁদের কাছ থেকে আদায় করেছি তাঁরা সকলেই শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের কথা। সেই সময়কার ছাত্র সরোজরঞ্জন চৌধুরী লিখেছেন: "ঋষি দ্বিজেন্দ্র-

নাথ একদিন সকালে দুই হাতে দস্তানা ও দুই পায়ে দুই জোড়া জুতো দুটি পাটি প'রে নিচুবাংলা থেকে বেড়াতে বেড়াতে শান্তিনিকেতনে জগদানন্দবাবুর বাড়ির উত্তর-পুব কোণায় এসে দুই হাত তুলে 'এই এই' বলে চিৎকার করছেন দেখে অঙ্কের ক্লাস করতে করতে জগদানন্দবাবু সেই দিকে তাকিয়ে আমাদের বললেন—'দেখো তো বড়োবাবু ওরকম করে কেন ডাকাডাকি করছেন।' আমরা দু-তিনজন ছুটে যেতেই বড়োবাবু বললেন—'দেখো তো পায়ে কিসে কামড়াচ্ছে ?' আমরা দেখি সমস্ত মোজা চোরকাঁটায় ভ'রে গিয়েছে, চলতে গেলেই সেগুলো খোঁচা মারে। আমরা তাড়াতাড়ি মোজা দুটি খুলে নিয়ে চোরকাঁটাগুলি বেছে ফেলে দিয়ে যখন আবার তাঁকে মোজা পরাতে যাচ্ছি, তিনি বললেন, 'না না, ওতে আর কাজ নেই।' আমরা তাঁকে বুঝিয়ে বললাম সব চোরকাঁটা বেছে দিয়েছি এগুলো আর খোঁচা মারবে না। তার পর তিনি মোজা পায়ে দিয়ে জগদানন্দবাবুর কাছে গিয়ে বললেন, 'দেখো জগদানন্দ, আমি একটা কবিতা লিখেছি, এটা কেমন হল দেখে আমাকে জানিয়ো, যদি কিছু সংশোধন করা উচিত মনে কর সংশোধন করে দিয়ো, কোনো শব্দ বদলালে যদি ভালো হয় বদলে দিয়ো।' জগদানন্দবাবু হেসে বললেন, 'আমার একটি কবি ছাত্র আছে আমি তাঁকে দিয়ে আপনার কাছে কবিতাটি পাঠিয়ে দেব।' তার পরেই জগদানন্দবাবু পরিহাস করে আগরতলার সোমেন্দ্রনাথ দেববর্মণকে ডেকে বললেন, 'ওহে কবি, বড়োবাবু এই কবিতাটি দিয়ে গেছেন, তুমি এটা ভালো করে দেখে যদি কিছু সংশোধন হয় করে আজই বিকেলে তাঁকে এটা দিয়ে তোমার মতামত জানিয়ে এসো।' সোমেনদা কবিতা দেখে বলেন 'মাস্টারমশায়, সর্বনাশ !—বড়োবাবুর কবিতা আমি দেখব! আমি তা পারব না, আমাকে মাফ করুন।' জগদানন্দবাবু বললেন, 'সে কি, তুমি এত বড়ো কবি হয়ে এ কথা বলছ! তা আমি ও-সব বুঝি না বাপু, তুমি তাঁর সঙ্গে বিকেলে দেখা করে যা বলবার বলে এসো।' অগত্যা সোমেনদা বিপন্ন হয়ে কবিতাটি বিকেলেই

বড়োবাবুকে ভয়ে ভয়ে দিয়ে বললেন, 'খুব চমৎকার হয়েছে, এটাতে সংশোধন করবার কিছুই নেই।' বড়োবাবু সোমেনদাকে কিছু মিষ্টি খাইয়ে বিদেয় করলেন।"

বড়োবাবু প্রায়ই জগদানন্দবাবুর কাছে এক-একটা ছড়া লিখে পাঠিয়ে দিতেন, আবার কখনো কখনো নিজে এসেও জগদানন্দবাবুকে হাতে হাতে কবিতা দিয়ে মজা উপভোগ করবার জন্যে জগদানন্দ-বাবুকে ঐ কবিতা ব্যাখ্যা করতে বলতেন। বলা বাহুল্য, জগদানন্দবাবু ব্যাখ্যা তো করতেনই না, তাঁর স্বাভাবিক মৃদু হাসি হেসে একটা সংকোচের ভাব দেখিয়ে নিজের মাথা চুলকাতেন। অমনি বড়োবাবু বিরাট অট্টহাসি হেসে নিজেই সেই কবিতার ব্যাখ্যা করতেন। ব্যাখ্যার পরে ফাঁকে ফাঁকে দুই পক্ষেই হাসাহাসি হত। হাসাহাসি হত মানে বড়োবাবুর হাসির সঙ্গে জগদানন্দবাবু মৃদু হেসে সায় দিতেন, বড়োবাবুর মুখ থেকেই পরিহাসবাক্য থেকে থেকে স্বচ্ছন্দে ঝরে পড়ত। জগদানন্দবাবু ছিলেন শান্তিনিকেতনে আসবার আগে ঠাকুর এস্টেটের একজন কর্মচারী। বড়োবাবুর সঙ্গে সমপর্যায়ে হাস্য-পরিহাস করবার সম্বন্ধ না থাকলেও বড়োবাবু সহজ সরলভাবে তাঁর সঙ্গে হাস্য-পরিহাস, গল্পসল্প কবতেন। তাঁদের দুজনের গল্পসল্প শুনলে কারো পক্ষে কল্পনা করাও শক্ত হত যে বড়োবাবু একদা ছিলেন জগদানন্দবাবুর মনিব পর্যায়ের। কোনো বিষয়ে কবিতা লিখে সেই কবিতার ব্যাখ্যা চাওয়া বড়োবাবুর যেন একটা খেলা ছিল। একবার আমি তাঁর এই খেলার প্যাঁচে পড়েছিলাম। আমি তখন শান্তিনিকেতনের নানা রকম কীট পর্যবেক্ষণ করতাম এবং 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ও অন্য দু-একটি কাগজে পর্যবেক্ষণের ফলাফল প্রবন্ধাকারে লিখে প্রকাশ করতাম। একদিন বড়োবাবু আমার উপরে লিখিত একটি ছড়ার ব্যাখ্যা আমার কাছেই চাইলেন। ছড়াটি এই—

'সুধাকান্তটি পোকার কীট,
কীটানন্দ গো তিনি।

লোকে বলয়ে আছে বায়ুর ছিট,
আমি কিন্তু তাঁকে চিনি।'

এই ছড়াটির যে কি ব্যাখ্যা করব আমি ভেবেই পেলাম না। তবু একটু হেসে ছড়াটির প্রশংসা করে বললাম, 'আমি পোকা-মাকড় ঘাঁটি আর লোকে আমাকে পাগল বলে এই তো এই ছড়ার মানে।' আমার কথা শুনে তিনি বললেন, 'কিচ্ছু বোঝ নি এর মানে। জান তো কীটে জিনিস নষ্ট করে, তুমিও তেমনি কীট ধ্বংস কর। লোকে তোমাকে পাগল বললে হবে কি, আমি তোমাকে চিনি। এটা তোমার একটা 'ছবি'।' এই বলে বড়োবাবু একচোট হাসলেন। আমি বললাম, 'আমি একটিও কীট ধ্বংস করি না। একটি গুটি-পোকা কেমন করে, কি পদ্ধতিতে প্রজাপতিতে রূপান্তরিত হয়, আমার গ্লাস-কেসে বন্দী জ্যান্ত গুটিপোকা লতাপাতা খেয়ে ধীরে ধীরে কেমন করে গুটিতে পরিণত হয়ে, তার পরে গুটি ভেদ করে কেমন প্রজাপতি হয় তাই দেখি। তার পর সেই প্রজাপতিকে গ্লাস থেকে মুক্তি দিই, মুক্তি পেয়ে সে যেখানে ইচ্ছে উড়ে চলে যায়।'

বড়োবাবু যে আমার উপরেই ছড়া লিখেছিলেন তা নয়, শান্তি-নিকেতনের সেকালের যে-সব ব্যক্তিদের সঙ্গে তিনি বেশ মন খুলে আলাপসালাপ করতেন, হাস্যপরিহাস করতেন, তাঁদের সম্বন্ধেও ছড়া লিখতেন। এর প্রমাণ পেলাম যখন দেখলাম সেকালের শান্তিনিকেতন পত্রে আমার নামের ছড়া সহ আরো কয়েকজনের নামে লেখা ছড়া প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আর একটা ছড়ার কথা মনে পড়ে গেল। ছড়াটি এই—

'শুনহ জগদানন্দ দাদা
গাধারে পিটিলে না হয় অশ্ব—
অশ্বে পিটিলে হয় গাধা।'

কেন এই ছড়াটি লিখেছিলেন বলি—একদিন বড়োবাবু শান্তি-নিকেতন থেকে বেড়িয়ে নিচুবাংলায় ফেরার পথে দেখলেন জগদানন্দ-বাবু তাঁর ক্লাসের একটি ছাত্রকে ধমকাচ্ছেন এবং দু-একটা চপেটা-

ঘাত দিচ্ছেন। এই দৃশ্য দেখেই তিনি নিচুবাংলায় ফিরে গিয়েই ছড়াটি লিখে মুনীশ্বরের হাতে জগদানন্দবাবুকে পাঠিয়ে দিলেন। জগদানন্দবাবু ঐ ছড়াটি পড়ে তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে মুচকি হাসলেন। তাঁর হাসি দেখে ক্লাসসুদ্ধ ছেলেরা ব্যাপার কি জানবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠল। ছেলেদের ঔৎসুক্য হাসিতে পরিণত হল যখন জগদানন্দবাবু ঐ ছড়াটি ছেলেদের পড়ে শোনালেন। ছড়াটি শুনে, যে ছেলেটিকে জগদানন্দবাবু শায়েস্তা করছিলেন সেই ছেলেটি বেশ সপ্রতিভভাবে বললে—'মাস্টারমশায়, আমি কিন্তু অশ্ব।' তার এই কথা শুনে ছেলেরা আবার সকলে হেসে উঠল। জগদানন্দবাবু সেই হাসিতে সানন্দে যোগ দিলেন। এই-ই ছিল তখনকার দিনে ছাত্র-শিক্ষক মধুর সম্বন্ধ। জগদানন্দবাবুর স্নেহময় ধমকানি এবং দুষ্টু ছেলেদের ঘাড়ে পিঠে দুই-একটি কোমল থাপ্পড়—তাও ছিল ছেলেদের পক্ষে উপভোগ্য। কারণ জগদানন্দবাবু ছেলেকে শাসন করতেন সাধারণ শিক্ষকের মতন নয়—স্নেহময় পিতার মতন। তাঁর ক্লাসে কোনো ছেলে পরীক্ষায় ফেল করলে তিনি দুঃখিত হতেন, মনে করতেন পরীক্ষায় ফেল করা ছেলের অকৃতকার্যতা যেন তাঁরই শিক্ষকতার ব্যর্থতা। এইজন্যেই দেখতাম তাঁর ক্লাসে শিক্ষণীয় বিষয়ে যে ছেলে অপটু বা দুর্বল তিনি তাঁর প্রতি বেশি কর্তব্যপালনের দিকে সচেতন থাকতেন এবং যেটাতে সেই অকৃতকার্য ছেলে পরবর্তী পরীক্ষায় অকৃতকার্য না হতে পারে সেইজন্যে তিনি নিজের বিশ্রামের সময়েও আরাম ত্যাগ করে সেই ছেলেটিকে নিজের ঘরে ডেকে শিক্ষণীয় বিষয় শেখাতেন। এইজন্য আমরা কয়েকজন ছাত্র নিজেদের মধ্যে পরিহাস করে বলতাম—মাস্টারমশায় যখন যাকে শাসন করেন বুঝতে হবে সে মাস্টারমশায়ের স্নেহদৃষ্টিতে পড়েছে, আর তার পাস না করে উপায় নেই। বাস্তবিক পক্ষে এরকম স্নেহময় পিতৃতুল্য শিক্ষক আজকাল দুর্লভ— দুর্লভ বলেই যে-সব ছেলেরা জগদানন্দবাবুর ক্লাসে পড়েছে তাদের তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি আজও অম্লান। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার

কথা মনে পড়ে গেল। ঘটনাটি এই: একবার 'শারদোৎসবে'র অভিনয়ের তোড়জোড় চলছিল। সেই অভিনয়ে শান্তিনিকেতনের কয়েকজন ছাত্র শিক্ষক এবং রবীন্দ্রনাথও যুক্ত ছিলেন। একদিন রিহার্সেলের সময় রবীন্দ্রনাথ একটি ছেলেকে তলব করলেন। ছেলেটি তখন জগদানন্দবাবুর অঙ্কের ক্লাসে ছিল, তাকে ডাকবার জন্যে রবীন্দ্রনাথের ভৃত্য সাধু যখন ক্লাসের সামনে গিয়ে উপস্থিত হল এবং জানালে যে গুরুদেব ঐ ছেলেটিকে রিহার্সেল দেবার জন্যে ডাকছেন—শুনেই জগদানন্দবাবু তেলেবেগুনে চটে উঠলেন, বললেন, 'আমার ক্লাসের ছেলেপিলেদের নিয়ে রিহার্সেল করা চলবে না, যাও, বাবুমশায়কে গিয়ে বলে দাও আমি এখন একে ছাড়ব না।' সাধু যখন গিয়ে দিনুবাবুকে জগদানন্দবাবুর কথা বললে দিনুবাবু তো চুপ, গুরুদেব দিনুবাবুর পাশেই বসেছিলেন, তিনি এই ব্যাপার শুনে একটুও বিরক্ত না হয়ে দিনুবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন—'দিনু আর ওদিকে ঘেঁষে দরকার নেই, ব্রাহ্মণ চটে গেছে, ব্রাহ্মণের রাগ আগুনের মতো, সব ভস্ম করে দেবে।' এর পর রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে স্বয়ং জগদানন্দবাবুকেও ঐ ছেলের সঙ্গে 'শারদোৎসব' অভিনয়ে যোগ দিতে হয়েছিল। তিনি লক্ষেশ্বরের পাঠ যেরকম সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন তা আজও তাঁদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে যাঁরা সেই অভিনয় দেখেছিলেন। আরো কতবার 'শারদোৎসবে'র অভিনয় হয়েছিল কিন্তু লক্ষেশ্বরের পাঠ তেমনটি আর কেউ করতে পারেন নি। তার পর ঐরকমভাবে যদি কেউ অভিনয় করে থাকেন তবে তিনি হচ্ছেন শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়। এই দুজনের লক্ষেশ্বরের পাঠের অভিনয় যাঁরা দেখেছেন তাঁরা ভোলেন নি।

রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাবার সংবাদ পেয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে আনন্দময় অভিনন্দন জানিয়ে নিচুবাংলা থেকে একটা চিঠি লিখে ভৃত্য মারফত রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়েছিলেন। বন্ধু সরোজরঞ্জন চৌধুরীর কাছ থেকে যে পত্রটি পেয়েছিলাম তাতে তিনি

লিখেছেন যে গুরুদেব সেই পত্র পেয়ে যখন দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে দাঁড়ালেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ আনন্দে রবীন্দ্রনাথকে জড়িয়ে নিজের পাশে একটি চৌকিতে বসালেন এবং সস্নেহে বললেন, 'রবি, এ সম্মান তোমার পূর্বেই প্রাপ্য ছিল। কিন্তু দেখ এজন্য যেন তোমার মনে কোনো অহংকার না আসে, খুব সাবধানে থেকো।' গুরুদেব খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে বড়োবাবুর কথা নির্বাক হয়ে শুনছিলেন। সরোজরঞ্জন লিখেছেন, 'এই দৃশ্য দেখে আমাদের মনে হয়েছিল যেন পিতা পুত্রকে উপদেশ দিচ্ছেন। যে এই দৃশ্য চোখে দেখেছে সে কখনোই ভুলতে পারবে না।'

সরোজরঞ্জন তাঁর পত্রে এ কথাও জানিয়েছেন যে গান্ধীজীর স্বরাজলাভের আন্দোলন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে-সব সমালোচনা করেছিলেন লিখিতভাবে, সে বিষয় উল্লেখ করে বড়োবাবু রবীন্দ্রনাথকে গান্ধীজীর নীতির বিরুদ্ধে লেখালেখি করতে নিষেধ করেছিলেন। বলেছিলেন, ভারতে প্রকৃত স্বরাজ গান্ধীজীই আনবেন। এই-সব উপদেশও তিনি রবীন্দ্রনাথকে এমনভাবে দিচ্ছিলেন যেন পিতা পুত্রকে উপদেশ দিচ্ছেন। যখন দ্বিজেন্দ্রনাথ ছোটো ভাই রবীন্দ্রনাথকে এই-সব উপদেশ দিচ্ছিলেন তখন সরোজরঞ্জন এবং গোবিন্দ চৌধুরী ও আর দু-তিন জন ছাত্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন। গোবিন্দ চৌধুরী, বড়োবাবু এবং গুরুদেবের সেই সময়কার একটি ফোটোগ্রাফও তুলেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত সেই ফোটোগ্রাফ এখন কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। বড়োবাবুর পশুপক্ষীর প্রতি যেমন স্নেহমমতা ছিল তেমনি মমতা ছিল গাছের ফুলের প্রতি। কোনোদিন দেখি নি তাঁর ঘরের টেবিলে ফুলদানি কিংবা কোনো রকমের ফুল। তাঁর নিচুবাংলার বাগানে কত রকমের ফুল ছিল, সেই ফুলগুলি নিজেও যেমন তুলতেন না, অন্য কেউ তুললে বিরক্ত হতেন। একবার মুনীশ্বর কয়েকটি কাঁঠালিচাঁপা ফুল তাঁর টেবিলে রেখেছিল এই ভেবে যে, উনি যখন ঐ ফুলের গন্ধ ভালোবাসেন তা হলে নিশ্চয়ই টেবিলে জড়ো-করা ফুলগুলি দেখে খুশি হবেন এবং ফুলের

গন্ধ উপভোগ করবেন। কিন্তু মুনীশ্বরের ধারণা ভুল প্রমাণিত হল, বড়োবাবু টেবিলে ঐ ফুলগুলি দেখেই মুনীশ্বরকে বললেন, 'এ কী করেছ, গাছের ফুল গাছে ফুটে ছিল, কেন পাড়লে। যাও এগুলি নিয়ে যাও।' মুনীশ্বর তাড়াতাড়ি ফুলগুলি টেবিল থেকে সরিয়ে নিলে। তার পর সময় সুযোগ মতো সেগুলি রবীন্দ্রনাথের টেবিলে একটি চীনেমাটির পাত্রে সাজিয়ে রেখে দিলে। রবীন্দ্রনাথ ফুলগুলি পেয়ে খুবই খুশি হলেন। মুনীশ্বর জানত রবীন্দ্রনাথ ফুল ভালো-বাসেন, তাঁর ঘরে ফুলদানিতেও ফুল থাকে। একবার সরোজরঞ্জন এবং তাঁর দু-একজন সঙ্গী বড়োবাবুর কাছে গিয়ে দু-একটি গোলাপফুল বাগান থেকে তোলবার প্রার্থনা জানালেন। প্রার্থনা মঞ্জুর হল না। তখন বড়োবাবু তাঁর ঘরের দক্ষিণের বারান্দায় বসে-ছিলেন, আর তাঁকে ঘিরে নানারকমের পাখি, কাঠবিড়াল খেলা করছিল। সরোজদা সেদিন গোলাপফুল সংগ্রহ করবার চেষ্টায় গিয়েছিলেন, বড়োবাবুর অনুমতি না নিয়ে তাঁর বাগান থেকে গোলাপফুল তোলা অসংগত মনে করে তাঁরা বড়োবাবুকে প্রণাম করে দাঁড়াতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন—'তোমরা কি চাও?' সরোজরঞ্জন বললেন, 'দু-একটি গোলাপফুল নিতে এসেছি।' সরোজরঞ্জনের কথা শুনে তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'তাই নাকি! দেখো তো গোলাপগুলি গাছে কেমন সুন্দর ফুটে আছে, এগুলি ছিঁড়ে কতটুকু আনন্দ পাবে! দুদণ্ড পরে এগুলি তো অযত্নে ফেলে দেবে। গাছে ফুটে ঝরে যাবার মধ্যে যে আনন্দ সেটা তোমাদের ভালো লাগছে না? কেন ওগুলি ছিঁড়বে! তোমরা এখানে বসে ফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করো।' সরোজরঞ্জন আর তাঁর সঙ্গীরা লজ্জিত হয়ে বারান্দায় কিছুক্ষণ বসে তার পর শান্তিনিকেতন আশ্রমে ফিরে গেলেন। আর একবার আশ্রমের দুটি ছোটো মেয়ের মনে খেয়াল হয়েছিল বড়োবাবুর বাগান থেকে কিছু ফুল সংগ্রহ করবার। তারা গিয়ে বড়োবাবুর কাছে ফুল তোলবার জন্যে অনুমতি চাইলে। বড়োবাবু বললেন, 'ফুলের গাছের

কাছে জিজ্ঞেস করো।' মেয়ে দুটি ফুলের গাছের কাছে গিয়ে গাছকে কিছু জিজ্ঞেস করেছিল কিনা জানি না। কিন্তু যখন তারা কয়েকটা ফুল এনে বড়োবাবুকে দেখালে, তিনি ফুল দেখে মেয়ে-দুটিকে বললেন—'গাছ কি বললে?' মেয়ে দুটি বড়োবাবুকে জানালে যে গাছ তাদের হ্যাঁ না কিছুই বলে নি। এই বলে তারা দাঁড়িয়ে রইল। বড়োবাবু অগত্যা আর কি করেন, বললেন, 'আচ্ছা, যাও।'

পূর্বেই বলেছি বড়োবাবু জগদানন্দবাবুকে এবং শাস্ত্রীমশায়কে কত স্নেহ এবং প্রীতির চোখে দেখতেন। একদিন সকালে বড়োবাবু, যেমন মাঝে মাঝে করতেন তেমনিভাবে শান্তিনিকেতনে বেড়াতে এসে শাস্ত্রীমশায়ের খোড়ো বাড়ির বারান্দার কাছে এসে উপস্থিত। তখন শাস্ত্রীমশায় এসরাজ বাজাচ্ছিলেন। শাস্ত্রীমশায় যে এসরাজও বাজান সেটা বড়োবাবু বোধহয় জানতেন না কিংবা হয়তো জানলেও তাঁর মনে ছিল না, তাই যেন বিস্মিত হয়ে বললেন, 'একি ব্যাপার! আমি তো জানি আপনি পুঁথি নিয়েই ব্যস্ত থাকেন, এসরাজ আবার কবে থেকে ধরলেন?' বড়োবাবুকে দেখে এবং তাঁর কথা শুনে শাস্ত্রীমশায় ব্যস্ত হয়ে এসরাজটি তক্তাপোশের উপর রেখে দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বড়োবাবুকে হাসতে হাসতে বললেন, 'রোজ বাজাই না, মাঝে মাঝে কোনোদিন শখ হলে কিছুক্ষণের জন্যে বাজাই, ভালো বাজাতে পারি না।' শাস্ত্রীমশায়ের কথা শুনেই বড়োবাবুর অট্টহাসি। অট্টহাসির পর বড়োবাবু বললেন, 'থাক, আজ আর অন্য বিষয় আলোচনা নয়, আপনি আর একটু বাজান শুনি।'

শাস্ত্রীমশায়ের কাছ থেকে নিচুবাংলায় ফেরবার পথে জগদানন্দ-বাবুর খোড়ো বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত। হবি তো হ, তখন জগদানন্দ-বাবুও তাঁর বেহালা বাজাচ্ছিলেন। বড়োবাবু জগদানন্দবাবুর কাছে উপস্থিত হতেই জগদানন্দবাবু তাঁকে প্রণাম করে যেন একটু অপ্রতিভ ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। বড়োবাবু সেখানেও আর বেশিক্ষণ না দাঁড়িয়ে বললেন— 'তুমি আর শাস্ত্রী কি পরামর্শ করে ঠিক

করেছিলে আজ আমাকে এসরাজ আর বেহালার বাজনা শোনাবে। এ তো বেশ মজা হল দেখছি, শাস্ত্রী হলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত আর তুমি হলে অঙ্কের মাস্টার আর বৈজ্ঞানিক-প্রবন্ধ লেখক, কিন্তু দুজনেই দেখছি বেশ রসিক। বাজনা তো শুনলুম তোমাদের। গানও গাওয়া হয় নাকি ? কই তোমাকে তো কোনোদিন গান গাইতে শুনি নি।' বড়োবাবুর কথা শুনে জগদানন্দবাবু একটু হেসে বললেন— 'বেহালা একটু বাজাতে পারি, গান শুনতে ভালো লাগে আমার, কিন্তু গাইতে পারি না।' তার পর বড়োবাবু সেখান থেকে বিদায় নিয়ে নিচুবাংলায় ফিরে গেলেন। সেদিন সকালে ঘটনাচক্রে আমিও বড়োবাবুর সঙ্গে ছিলাম। ইচ্ছে ছিল বড়োবাবুর সঙ্গেই নিচুবাংলা পর্যন্ত যাই, কিন্তু যাওয়া হল না। তিনি আমার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে বললেন, 'এখন আমার সঙ্গে গিয়ে গল্পসল্প করা চলবে না। আমাকে গিয়ে এখন একটা বই নিয়ে বসতে হবে। তুমি বিকেলে এসো।'

বড়োবাবুর নির্দেশমতো বিকেলে নিচুবাংলায় গিয়ে হাজির হলাম। বড়োবাবু তখন তাঁর ঘরের দক্ষিণের বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসেছিলেন। প্রণাম করে পাশে মোড়ায় বসে প্রথমেই তাঁকে বললাম, 'আজকে আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করে বিরক্ত করব।' আমার কথা শুনে তিনি বললেন, 'প্রশ্ন তো তুমি রোজই কর। যে-সব উত্তর দিই তার মর্ম তোমার মাথায় ঢোকে তো ? আমি তো তোমার প্রশ্নের জবাব দিতে কসুর করি না। আচ্ছা বেশ, তোমার কি প্রশ্ন আছে বলো।' আমি বললাম, 'আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে-সব হিন্দুরা এক-একটা সম্প্রদায় বা সমাজ বা ধর্ম সম্প্রদায় গড়েছেন তাঁরা তাঁদের সমাজে নানারকম সংস্কার ঘটিয়েছেন, নানা-রকমের এমন সব সামাজিক প্রথার এবং ধর্মচিন্তার নতুনত্ব এনেছেন যা হিন্দুসমাজে প্রচলিত ছিল না, যেমন অসবর্ণ বিবাহ, অস্পৃশ্যতা মোচন, গুরুবাদ ত্যাগ, পৌত্তলিকতা ত্যাগ ইত্যাদি। এ-সব হওয়া সত্ত্বেও বিরাট হিন্দুসমাজ যেমনকার তেমনি আছে অর্থাৎ বিপুল সংখ্যক হিন্দুদের মধ্যে আজও অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত হয় নি,

পৌত্তলিকতা যেমন ছিল তেমনি আছে, অস্পৃশ্যতার বিচার যেমন ছিল তেমনি আছে ; সেই বিপুল সংখ্যক হিন্দুরা ব্রাহ্ম-সমাজকে, আর্যসমাজকে, বৌদ্ধসমাজকে অহিন্দু-সমাজ বলে গণ্য করে, শুধু এই-ই নয়, এক দল সনাতনপন্থী-হিন্দু চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবসমাজকেও 'বোষ্টম'-সমাজ বলে যেন কতকটা ঘৃণার ভাব প্রকাশ করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সমাজ-সংস্কারের তথা ধর্ম-সংস্কারের চিন্তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এক-একজন উদারচেতা মানুষ এক-একটা ধর্মসম্প্রদায় গ'ড়ে সাম্প্রদায়িক সমস্যাই বাড়িয়েছেন, আসলে কিন্তু বিরাট হিন্দুসমাজকে প্রচলিত সমাজচিন্তা থেকে মুক্ত করতে পারেন নি। তা হলে হিন্দুদের উন্নতি হল কিসে ? লাভের মধ্যে হল হিন্দুরা বহু শাখায় বিভক্ত হয়ে অনৈক্যের জটিলতার মধ্যে পড়ল, যা ছিল এক, তা হল বহু।'

আমার কথা শুনে বড়োবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি যে-সব কথা বললে তার সঙ্গে কি তোমার প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে দেখেছ ? না, মনে মনে যা ভেবেছ এক নিশ্বাসে তাই বলে গেলে ?' তাঁর এই কথা শুনে আমি বললাম, 'হিন্দুসমাজে থেকেই যা দেখছি, যা শুনছি তাই তো আমার অভিজ্ঞতা। এর চেয়ে বেশি আর অভিজ্ঞতা কোথায় পাব।' আমার কথা শুনে তিনি হেসে বললেন, 'যা দেখেছ তাও ভালো করে দেখ নি, যা শুনেছ তাও ভালো করে শোন নি। তোমার এই অভিজ্ঞতা ফাঁপা ঢোল, ভিতরে কিছু নেই, তাই এত বোল বলছ।' তাঁর কথা শুনে আমি বললাম, 'তা হলে আমাকে আমার অনভিজ্ঞতা কোথায় তা বুঝিয়ে দিন।' আমার কথা শুনে তিনি বললেন, 'তোমার মতো N. P. P.-কে কত আর বোঝাব, যদি একটু পড়াশুনা করতে তা হলে নিজেই বুঝতে পারতে, তা তো আর করবে না, যা কষ্ট করে জানতে হয় তা সহজে কারো কাছে কয়েকটা কথা শুনে জানা যায় না। তবু তোমাকে এ সম্বন্ধে অল্প কথাতেই যা বলি তাই মন দিয়ে শোনো, তার পর ভালো করে চিন্তা করে ভেবে দেখো, আমার উত্তর তোমার মনে লাগে

কিনা।—তুমিই বলছ যাঁরা নতুন নতুন সম্প্রদায় তৈরি করেছেন তাঁরা হিন্দুসমাজে নানা শাখার সৃষ্টি করেছেন। বেশ, তা হলে ধরে নেওয়া যাক তোমার কথামতো বিপুল হিন্দুসমাজ একটা গাছ, আর এই-সব সম্প্রদায়গুলো হল তার বিভিন্ন শাখা। এটা তো জানো যে একটা গাছ সম্প্রসারিত হয় বহু শাখা-প্রশাখার দ্বারা। এই সম্প্রসারণ গাছের যদি না ঘটে তা হলে গাছ একঠ্যাংগা হয়ে ক্রমাগত বেড়ে শেষটায় মচকে ভেঙে যায়। আবার এটাও বোধ হয় জানো যে একটা গাছে খুব বেশি সংখ্যক ডালপালা হলে গাছ সে সবগুলিকে ধরে রাখতে পারে না, অনেক ডালপালা ভেঙে চুরে যায় এবং গাছকেও ক্ষতবিক্ষত করে, এইজন্য যখন কোনো গাছে অনাবশ্যক বেশি ডালপালা হয় তখন গাছকে শক্ত এবং সজীব রাখবার জন্যে মানুষেরা গাছের ডালপালা কেটে ছেঁটে দেয়। যেখানে মানুষের হাত নেই সেখানে প্রকৃতিই কাটছাঁটের কাজ করে। এখন তোমাকেই জিজ্ঞেস করি তুমি যে সাত জাতের হাতের রান্না খেয়েও দিব্যি হিন্দুসমাজে চলাফেরা করছ, সামাজিক ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠানে স্বচ্ছন্দে গিয়ে হাজির হচ্ছ, এই-সব কাজ যদি তোমার বাবা-ঠাকুরদাদা হিন্দুসমাজে থেকেই করতেন তা হলে লোকেরা তাঁদের সমাজচ্যুত করত, আরো কত রকমের অত্যাচার তাঁদের ভাগ্যে ঘটত। কিন্তু তুমি যে এখন বেশ সহজভাবে হিন্দুসমাজে থেকেই এ-সব করতে পারছ তার কারণ হচ্ছে এই-সব শাখা-সম্প্রদায় যেমন ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ, বৌদ্ধসমাজ, বৈষ্ণবসমাজ— এই-সব সমাজের প্রভাব গৌণভাবে এবং মুখ্যভাবে হিন্দুসমাজের উপরে পড়েছে, অস্পৃশ্যতাও গ্রামে না হোক শহুরে হিন্দুসমাজে বহুল পরিমাণে কমেছে। দিন যত যাবে তত আরো কমবে। হিন্দুসমাজের অন্তর্গত যে-সব বিভিন্ন সম্প্রদায় আজও সেকেলে সাম্প্রদায়িক ভাব নিয়ে আছে সে-সব সাম্প্রদায়িকতাও ধীরে ধীরে ঘুচবে, আগে ঘুচবে শহরে তার পর গ্রামে। তুমিই আমাকে বলেছ তোমার বাবা হিন্দুসমাজে থেকেই তোমার এক অল্পবয়স্কা বিধবা দিদির বিবাহ

ব্রাহ্ম মতে একজন ব্রাহ্মণ যুবকের সঙ্গে দিয়েছিলেন এবং সেই দিদির মেয়েরা স্বচ্ছন্দে তোমাদের হিন্দু পরিবারে মেলামেশা করছেন, হিন্দুসমাজের বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানে যোগও দিচ্ছেন। এ-সব ব্যাপার কি শহুরে হিন্দুসমাজেও একশো বছর আগে সম্ভব ছিল? নিশ্চয়ই না। তুমিই বলেছ তোমার বাবা ছোঁয়াছুঁয়ি ব্যাপার অর্থাৎ অস্পৃশ্যতা-প্রচলিত রীতিকে মান্য করতেন না, তিনি সব জাতের হাতের ছোঁয়াই খেতেন, তবুও স্বসমাজে কারো কাছে লাঞ্ছিত হন নি। এখন তো দেখতেই পাচ্ছ শহুরে হিন্দুদের মধ্যে কত হিন্দু হোটেলে গিয়ে মুরগির মাংস খেয়ে আসছে, কই তারাও তো নিজেদের সমাজে নিগৃহীত হচ্ছে না। তুমি হয়তো বলবে— এই-সব হিন্দুরা লুকিয়ে হোটেলে এই-সব খেয়ে আসে। আমি বলব—হ্যাঁ, তারা লুকিয়ে খেয়ে এলেও এই খেয়ে আসাটা একেবারে ওপ্‌ন্‌ সিক্রেট। এইভাবে কত রকমের সেকেলে প্রচলিত হিন্দুসমাজের রীতি যে দিনে দিনে ভেঙে যাচ্ছে তা কি ভেবে দেখেছ! আর-একটা কথা বলি শোনো, হিন্দুসমাজের পরিচালক তো ব্রাহ্মণরাই, সে তো জানোই, কিন্তু একবার ভেবে দেখো এই ব্রাহ্মসমাজের গোড়ায় ব্রাহ্মণ, বিধবাবিবাহ প্রচলনের গোড়ায় ব্রাহ্মণ, দেখ-না রামানন্দবাবু (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়) গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে, তিনি হলেন ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী, বিদ্যাসাগরমশায় গোঁড়া ব্রাহ্মণ ঘরের ছেলে, তিনি হিন্দুসমাজে বিধবা-বিবাহ আইন পাস করালেন। প্রচলিত মতে তোমরা যাকে 'বোষ্টম' সম্প্রদায় বল, সেই সম্প্রদায়ের মূলেও চৈতন্যদেব। কাজেই দেখ— এক-একজন শক্তিশালী হিন্দুর সমাজ-সংস্কারনীতি, সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে নতুন সম্প্রদায়গঠন, হিন্দুসমাজকে আঘাত দেয় নি বরং সেই হিন্দু-সমাজে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এবং সংস্কার এনে দিয়েছে— এই সংস্কার এনে দেওয়ার গতি মন্থর হলেও এই মন্থরতা বেশি দিন থাকবে না, গতি দ্রুত হবেই। এই রকমের সামাজিক অনেক ব্যাপারের নতুনত্ব, যদি তার প্রয়োজন থাকে, গোড়ায় গোড়ায় সেকেলে পন্থীদের কাছে

বাধা পেলেও শেষ পর্যন্ত নিজের পথ স্বচ্ছন্দ করে নেয়। এই তো মোটামুটি তোমাকে বললাম। কিন্তু সংক্ষেপে একটি কথা বলি— হিন্দুসমাজের মধ্যে থেকেই যে তাঁরা এই-সব নতুন নতুন সম্প্রদায় গড়বার এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার আনবার কথা ভেবেছিলেন তা কিন্তু ষোল-আনা ঠিক নয়। এই-সব বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা সমাজের মধ্যে নানাভাবে তন্দ্রার ঘোরের মতো ছিল, এটা ঘটেছিল বিরাট হিন্দুসমাজের উপরে বহু বৎসর ধরে বিভিন্ন জাতির আক্রমণজাত সংস্পর্শের জন্য। এই অর্ধসুপ্ত চেতনার মুখপাত্র হিসেবে গণ্য করা চলে সমাজ-সংস্কারকদের। এই দেখো-না, আমাদের শাস্ত্রী, তিনি তো বলতে গেলে গোঁড়া ব্রাহ্মণ, স্বপাক খান, কেবল টুলো পণ্ডিতের মতো সাদাসিধে থাকেন, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, কিন্তু তিনি উদার। সাধারণ ব্রাহ্মণরা যে-সব নিয়ম নীতি প্রচলিতভাবে পালন করেন, শাস্ত্রীমশায় চিন্তায় এবং কাজে সেই-সব প্রচলিত রীতি যদি মেনে চলতেন তা হলে কখনোই অত সহজে গান্ধীজী এবং অ্যাণ্ড্রূজ সাহেবের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে শ্রদ্ধা জানাতে পারতেন না। তিনি উদার বলেই এবং হিন্দুত্ব সম্বন্ধে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান থাকায় এবং হিন্দু শাস্ত্রে তিনি পণ্ডিত বলেই গান্ধীজীকে এবং অ্যাণ্ড্রূজ সাহেবকে গুণ-ব্রাহ্মণ মনে করেন। এই রকমের অনেক উদারপন্থী ব্রাহ্মণদের এবং ব্রাহ্মণেতর শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমাজ-সংস্কারের ভাব এবং চিন্তা থাকার জন্যেই যাঁরা সমাজ-সংস্কারকরূপে আমাদের কাছে বিশিষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছেন তাঁদের পক্ষে সক্রিয়ভাবে সম্প্রদায়-গঠন সম্ভব হয়েছিল। হয়েছিল এইজন্যে যে তাঁরা ঐ-সব উদারপন্থী ব্রাহ্মণদের এবং ব্রাহ্মণেতর হিন্দুদের কাছ থেকে মুখ্যভাবে না হোক গৌণভাবে উৎসাহ পেয়েছিলেন। অনেকের মধ্যেই সমাজ-সংস্কারের চিন্তা এবং ভাবনা হয়, কিন্তু নানা অনিবার্য কারণে তাঁরা সক্রিয়ভাবে সংস্কার-কার্যক্ষেত্রে নামতে পারেন না— তবুও সমাজ-সংস্কারকদের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতি প্রকাশ্যভাবে কতকটা এবং কতকটা প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। এই সহানুভূতি থাকার জন্যেই এক-একজন

শক্তিমান বলিষ্ঠ চরিত্রের ব্যক্তি এঁদেরই মুখপাত্র হয়ে দেখা দেন।' এই বলে বড়োবাবু সেদিনকার মতো আমার প্রশ্নের জবাব শেষ করলেন। জবাব শেষ করে বললেন, 'এ-সব বিষয়ে বলবার অনেক কিছু আছে, কিন্তু আজ এই পর্যন্তই থাক। যা শুনলে তাই নিয়ে চিন্তা কোরো, আর পার তো কিছু বই-টই পড়বার চেষ্টা কোরো।'

•

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কয়েক বৎসর পর্যন্ত আমি শান্তিনিকেতনে একটানা ছিলাম না, ছিলাম বীরভূম জেলার সদর সাবডিভিসন সিউড়ি শহরে। এই ক' বছর একটানা শান্তিনিকেতনে না থাকলেও কখনো মাসে দুবার দু-একদিনের জন্যে কখনো বা দু-একমাস পরে তিন-চার দিনের জন্যে নানা কার্যোপলক্ষে শান্তিনিকেতনে আসতে হত। কার্যোপলক্ষে এলেও সময়ের স্বল্পতা-হেতু বড়োবাবুর কাছে যেমন আগে বসে গল্পটল্প করতাম তেমনভাবে গল্প করবার সুযোগ ঘটত না। কাজেই ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, অনেক খুঁটিনাটি বিষয় আমার জানা নেই। তবে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে যেদিন সিউড়ি থেকে শান্তিনিকেতনে এসেছিলাম, স্বভাবতই ইচ্ছে হয়েছিল বড়োবাবুর সঙ্গে, বড়োমার সঙ্গে, দিনুবাবুর সঙ্গে বিশেষভাবে দেখা করবার। এঁদের সঙ্গে দেখা করেছিলাম, সকলকেই শোকাহত দেখলাম। বড়োবাবুকে প্রণাম করে কিছুক্ষণ তাঁর কাছে বসে থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম যে তিনি শোকে বিশেষ কাতর। দু-একটি কথা মাত্র তিনি আমাকে বলেছিলেন। তার মধ্যে দুটি কথা আমি এখনো ভুলতে পারি নি। তিনি নিতান্ত অসহায় শিশুর মতন বলেছিলেন, 'দ্বিপু চলে গেলেন। আমার দেখা-শোনা সব কর্তব্যই যে ছিল তাঁর। আমি যেন অভিভাবকহীন হয়েছি। অমন করে আমার খবরদারি আর কে করবে। আশেপাশে তো সকলেই আছেন, কিন্তু দ্বিপুর অভাবটা খুবই অনুভব করছি।' তার পরেই তিনি চুপ করে বসে রইলেন।

আবার কিছুদিন পরে দু-একদিনের জন্যে শান্তিনিকেতনে এসেছিলাম। বড়োবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। মনে হল তাঁর সাবেকি মনের প্রকৃতি যেন পালটে গেছে। কথায় বার্তায় শান্ত গাম্ভীর্য, চেহারায় যেন একটা অধ্যাত্মভাবের পরিপূর্ণ শান্তি। আমি গিয়ে তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি বললেন, 'কেমন আছ, তোমার ছেলেমেয়েরা ভালো আছে তো?' উত্তরে আমি বললাম —সকলেই ভালো আছে। আমার কথা শুনে তিনি সস্নেহে বললেন, 'আশীর্বাদ করি তোমরা সকলেই সুখে থাকো, ভালো থাকো।'

এরপর শান্তিনিকেতনে এলাম মর্মান্তিক খবর পেয়ে যে বড়োবাবু আর নেই। বোলপুর থেকে শান্তিনিকেতন আশ্রমে আসতে হলে প্রথমেই নজরে পড়ে শান্তিনিকেতনের উত্তরে স্থিত নিচুবাংলা। নিচুবাংলার কাছে এসেই আমার পা যেন আর চলে না, মন ভারাক্রান্ত। কিছুতেই নিচুবাংলার ভিতরে ঢুকতে মন সরছিল না, তবু ঢুকতে হল বড়োমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে। নিচুবাংলায় ঢুকেই মনে হল যেন সবই যেমন ছিল তেমনি আছে, কিন্তু তারই মধ্যে সব যেন ফাঁকা— যেন একটি পাখি-হীন শূন্য পিঞ্জর।

মন বিষাদে ভরে উঠল, বড়োবাবু বেঁচে থাকার দিনের স্মৃতি মনের মধ্যে হাহাকার করে উঠল। এই বিষাদময় স্মৃতি-বেদনায় সেদিন গভীর আবেগে যে কবিতাটি লিখেছিলাম (প্রবাসী, পৌষ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ) সেটি এই স্মৃতিকথায়, বড়োবাবুর প্রতি আমার শ্রদ্ধা-প্রণতি স্বরূপে সন্নিবেশিত করলাম :

দ্বিজেন্দ্রহীন দ্বিজেন্দ্র-আলয় দর্শনে

হেথা আমলকী-বনে থেমে গেছে গান
ডালে ম্রিয়মাণ পাখি।
হেথা নব ফাগুনের আনন মলিন
অশ্রুসজল আঁখি।

হেথা আকাশের নীলে বিষাদের ছায়া,
পবনে কাঁদন ভরা—
হেথা গোলাপের রাঙা অধর হাসিটি
বেদনায় আধমরা।
হেথা মুদেছে নয়ন প্রকৃতি-দুলাল,
মেলিবে না আঁখি আর,
হেথা নিবেছে প্রদীপ, স্বরগ-কিরণ
আলোকে হাসিত যার।
হেথা কাঠবিড়ালীর মরমে জ্বলিছে
দারুণ বিরহ জ্বালা,
হায় কে বুলাবে হাত অঙ্গে তাহার
পরশ শান্তি-ঢালা!
হেথা বনের প্রাণীরা মানুষের সাথে করিত আলাপ কত,
আজ কোথা সেই ছবি, সব হল শেষ দেবতা হয়েছে গত

হেথা বহিত সদাই হাসি-তরঙ্গে
উছল প্রাণের ধারা,
ধনী নির্ধনী লাগি সম স্নেহ সুধা
বহিত বাঁধন হারা।

২

ছিলে শিশু ভোলানাথ, ক্ষণেকে রুষ্ট
তুষ্ট ক্ষণেক পরে,
ক্রোধ করে দিতে শোধ মন খোলা হাসি
প্রাণ ঢালা ক্ষমা-ভরে।
ধূলি মণি-কাঞ্চন এক সাথে নিয়ে
করিতে সহজ খেলা;

তাই মাটিরে করিতে সোনার স্বপন
সোনারে করিতে ঢেলা।
গেছ অমর আলয়ে মর দুনিয়ার
সকল মাধুরী নিয়ে
হেথা বন্ধুজনের মরমে মরমে
বিরহ-বেদনা দিয়ে।
হেথা সংসারে রহি, রহি বন্ধনে দেখালে জগৎ জনে—
রোজ কেমনে মুক্তি-পরশ লভিতে হরষ-তৃপ্ত মনে।

তুমি বৃদ্ধ বয়সে ফাঁকি দিয়ে রোজ
যৌবনে করি ভর—
ঐ আমলকী-বনে অট্টহাসির
ছুটাইতে নির্ঝর।

আজি সকলি হেথায় শূন্য নিরখি,
চলে গেছ সুন্দর,
সবি আছে নাই তুমি, এই ঠাঁই তাই
পাখিহীন পিঞ্জর।
হে তাপস, যেথা রহ আজি তুমি সেথা হতে লহ মোর
প্রাণের প্রণতি শ্রদ্ধা ভকতি মিশ্রিত আঁখিলোর।

পরিশিষ্ট

১

শান্তিনিকেতন

১

শান্তিনিকেতন না যদি দেখিলে
নয়ন তবে কী কারণ ?
দেখিবার যত যা আছে নিখিলে
সবার শির-আভরণ ॥

২

ডাঙার রাজা গো ভুবন-ডাঙা
ধ'রে যারে শিখরে নিজ।
ভারতী-জননীর চরণে রাঙা
মজিয়া রহে যেথা দ্বিজ ॥

৩

যেথায় বিধু রবি না জানি অস্ত,
জাগি থাকি জাগান লোক।
নৃপাল, রাজকাজে সঁপিয়া হস্ত
সব দিকে রাখেন চোখ ॥

৪

অ্যাকা-নবরতন ক্ষিতিমোহন
ভকতি-রসের রসিক।
কবীর-কাম-ধেনু করি দোহন
তোষেন তৃষিত পথিক ॥

৫

জগদানন্দ বিলান জ্ঞান
গিলান পুঁথি ঘর-জোড়া।
কাঁঠাল গুলান্ কিলিয়ে পাকান,
গাধা পিটি করেন ঘোড়া ॥

৬

রবি-রথের কী-যে সারথি, রথী।
যেমন বীর, তেমি ধীর!
কোনো কাজেই তাঁর নাহি বিরতি,
ভারতীর কিবা লক্ষ্মীর॥

৭

দিনু দাদাজির কী ক'ব কাহিনী
বীণাপাণির সে-যে শিষ্য।
উথলি উঠে যবে রাগ-রাগিণী,
পুথলী বনি যায় বিশ্ব॥

৮

করয়ে যেমতি দ্বিপযুথ-পতি
গহন বনে ঘোরা-ফেরা;
সভায় দ্বিপ নৃপ রাজে তেমতি
বন্ধু-বান্ধবে ঘেরা॥

৯

কোথা গো ডুব মেরে র'য়েছ তলে
হরিচরণ, কোন গরতে?
বুঝেছি, শবদ-অবধি-জলে
মুঠাচ্ছ খুব্ অরথে॥

১০

সন্তোষে নেহারিলে জুড়ায় আঁখি
শিশু-সমান নিরদোষ।
কটু-ই বা কী মধুর-ই বা কী
সব তাতেই তাঁর তোষ॥

১১

কালীমোহনের অশেষ গুণ,
যে তাঁরে জানে— সে-ই জানে।

দীন দুখে হৃদয়ে জ্বলে আগুন।
অবিচার সহে না প্রাণে॥

১২

সুধাকান্তটি পোকার কীট্।
কীটানন্দ গো তিনি।
লোকে বলে আছয়ে বায়ুর ছীট্—
আমি কিন্তু তাঁরে চিনি॥

১৩

মহারাষ্ট্রীয় গুণী যুবক
'ভীমরাও' ধরেন নাম।
সংগীতের তিনি অধ্যাপক,
সরলমতি শুভকাম॥
বিশারদ নহেন গানে কেবল—
জ্ঞানেও জ্ঞান ডুব সাঁতার,
বেদান্ত সাংখ্য পাতঞ্জল
নখদরপণে তাঁহার।

১৪

অনিলকে এখনো পাওনি টের—
বাজারে বাজাব না ঢাক।
ডান-হাত বাঁ-হাত দ্বিজরাজের
এই অবধি এবে থাক॥

১৫

প্রমদা-রঞ্জন থাকেন আড়ালে
ইংরাজিতে সুনিপুণ,
পড়ান ছাত্র সকালে-বিকালে
কারো নহেন তিনি ন্যূন॥

১৬

প্রভাতের মুখ সদা প্রফুল্ল
পুঁথিশালার অধ্যক্ষ।
আগলান নানা পুঁথি অমূল্য—
পোঁতা ধন যেমতি যক্ষ ॥

১৭

নগেন্দ্র আইচ্ শান্ত শিষ্ট,
শিক্ষাদানে মজবুত।
দেহটার তরে— হায় অদৃষ্ট
মন করে খুঁৎ খুঁৎ।

১৮

উপেন সঁপেন বিদ্যা অন্ন
কচি ছেলেদের মুখে।
ছাপাখানার হয়ে পতি অনন্য
বিহরেন মনের সুখে ॥

১৯

ধী-মু গোরাচাঁদ বয়স কাঁচা,
সুরেন কর তেজেশ,
সবাই একেকটি রতন সাঁচা,
বাখানিয়া কে করে শেষ ॥

২০

দ্বিজের লেখনী আর তো চলে না
বড্ড সে গো পরাধীনা ;
চষিলে শুখা-ভূমি ধান্য ফলে না
দেবতার বরিষণ বিনা ॥

অনিলগ্রস্ত পদাবলী

অনিলের প্রতি দ্বিজের আহ্বান মন্ত্র

২৭ কার্তিক বৃহস্পতিবার

কালিকে ছিল তোমার পুরা অবকাশ
মিটালেনা তুমি মোর আঁখির পিয়াস ॥
কষটি-পাথরে তাই, পরীক্ষার পাকে,
ঘষিনু তোমার দীপ্ত অনুরাগটাকে।
শিলাপটে দিল দেখা দুঃখ কারে কই—
শ্রান্তি ক্লান্তি অবসাদ শত্‌করা নব্বই।

(২৮ কা, শু)

যে দিলে মোরে ফাঁকি গায়ে মাখি লৈনু তাহা।
কথার ফের ফার, ঘুচাবার দেখিনা রাহা ॥
এবার স্বজনের বচনের মূল্য যে কি—
বুঝিনু ভাল মতে, বন-পথে বিপদে ঠেকি ॥

(২৯ কা, শ)

দিব্য ফরসা আজিকে দিন-টা।
আকাশ-ঘড়িতে বেজেছে তিন-টা ॥
তোমার ঘড়িতে ক-টা না-জানি।
বিলম্বে হয় কার্য হানি ॥
ঢং ঢং পুন ঢং !
শুভস্য শীঘ্রং !!

(৩ অগ্রহায়ণ, বু)

তোমারে লইয়া হায়
হ'ল বিষম দায় !
বেলা যে যায় যায়—
নাহি কি লাজ !

শীঘ্র এস এই বেলা,
এ নহে ছেলে খেলা !
কোরো না অবহেলা
হাতের কাজ ॥

(৪ অ, বৃ)

তুমি গো গন্ধবহ, মন্দ নহ
অথচ নাম লহ 'মন্দ বায়'
তোমার ভাব বোঝা, নহে সোঝা,
দ্বিজ আচার্য ওঝা হারিয়া যায়।
তোমার এ যে রীত বিপরীত
হারিলে হয় জিত, জিতিলে হার।
হলে তুমি মন্দ, হয় আনন্দ,
হইলে আনন্দ, ঠ্যাকানো ভার ॥

(৫ অ, শু)

আজিকে করিও না কাল-বিলম্ব,
ওহে অনিল দুরদাম।
বেলাবেলি করিয়া কার্যারম্ভ
হ'তে চাই সফল-কাম ॥

(৬ অ, শ)

না আসিলে অনিল করিয়া ত্বরা,
দ্বিজ হয় জিয়ন্তে মরা,
ধরা বিষাদ-ভরা
যেন শ্মশান।
অনিল এলে পরাণ ফিরে পাই !
আমাতে এবে আমি নাই।
করিছে আইঢাই
আকুল-প্রাণ।

সায়ংকাল

প্রবল অনিলে ফুলেছে পাল,
দ্বিজ-মাঝি রহে ধরিয়া হাল,
উঠেছে ঘোর তুফান।
(নেপথ্যে) পদ্মানদী সে তো শিশির বিন্দু!
বাস রে!! এ যে অকূল সিন্ধু!!
সাবধান সাবধান!!!

(৭ অ, র)

সহজা দ্বিজরাজে ধরিল জাড্য,
রাহু যেন মেলিল দাঁত।
এলিয়া পড়েছে মনের দাঢ্য,
কাজে আর সরে না হাত॥
শীঘ্র এসে অ্যাক চপেটাঘাতে
রাহুটারে কর গো দূর।
আধেক গিলেছে সে রজনী-নাথে
গেলে না যেন ভরপূর॥

(৯ অ, স)

কাজ সারি ফেলি, বেলা বেলি,
বাধা-বিঘন ঠেলি, এস গো এস।
ছাড়ি মলয়ের ফণি-ঘের,
কাট বেড়ালীদের সঙ্গে মেশো।

(১১ অ, ব্‌)

দখিনে উতরে উদয়ে অস্তে,
গতি তোমার সরবত্র।
তোমাদের গুরুদেবের হস্তে
সঁপি দিবে এই পত্র॥

বলিবে "নমো রবয়ে।
বড় দাদার তব এ
বিচিত্র হাতের লেখন।
পড়িয়া দেখি সত্বর,
দিবেন এর উত্তর
বিদায় হই এখন॥

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প রি শি ষ্ট

২

মহামতি দ্বিজেন্দ্রনাথ

মহাপ্রস্থান

দ্বিজেন্দ্রনাথের অনেক কথা অনেকেই জানেন, আবার এমনও অনেক কথা আছে যাহা অনেকেই জানেন না। এই-সমস্ত কথার মধ্যে শুনিবার, শিখিবার ও বুঝিবার অনেক আছে। আজ কেবল তাঁহার মহাপ্রস্থানের কথাই সংক্ষেপে বলিব। 'ভারতী'র প্রতিষ্ঠা তাঁহারই হস্তে হইয়াছিল, তাই তাঁহার পাঠকবর্গের ইহা জানিবার ইচ্ছা স্বভাবতই হইতে পারে।

১৩২৩ সালে তাঁহার একবার গুরুতর পীড়া হইয়াছিল। তাহার পূর্বে তিনি বলিতেন, ত্রিশ-বত্রিশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার মাথাও ধরে নাই, আর কোনো ওষুধও খাইতে হয় নাই। তাঁহার স্বাস্থ্য এইরূপই ভালো ছিল। তবে বয়সের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জরা ও দৌর্বল্য ক্রমশই বাড়িয়া উঠিয়াছিল। দৃষ্টিশক্তিও কমিয়া গিয়াছিল। ইহাতে তাঁহার লেখাপড়ার অসুবিধা হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও ক্বচিৎ কখনো সামান্য এক-আধটু সর্দি বা জ্বর ছাড়া মৃত্যুর দশ-বারো ঘণ্টা পূর্বে পর্যন্ত তাঁহার কোনো গুরুতর পীড়া লক্ষিত হয় নাই। তাঁহার এইরূপ স্বাস্থ্যের একটি প্রধান কারণ মনে হয়, তাঁহার আহারাদি সম্বন্ধে সংযম ও নিয়মানুবর্তিতা, যাহা তাঁহার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত দেখা গিয়াছিল।

তিনি প্রতিদিন ভোর সাড়ে চারটার সময় শয্যাত্যাগ করিতেন এবং শৌচাদি শেষ করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই ঠাণ্ডা জলে স্নান করিতেন। শেষ দিন পর্যন্ত ইহার অন্যথা হয় নাই। ৩রা মাঘ, রবিবার। স্নান শেষ করিয়া তিনি নিজের ঘরের দক্ষিণ দিকে বারাণ্ডায় বসিয়াছেন। উপাসনা হইয়া গিয়াছে। নিয়মমত জলযোগের দ্রব্য সম্মুখে দেওয়া হইয়াছে— কয়েকখানা আদার কুচি, চারিটি করিয়া থালায় ছয় জায়গায় সাজানো চব্বিশটি ভিজানো ছোলা, জল দিয়া মাখা একটু ছোলার ছাতু— ইহার কিয়দংশ লম্বা করিয়া ছুরি

দিয়া একটু একটু দাগ কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। উদ্দেশ্য এক-একটি দাগ হইতে ছিঁড়িয়া লইয়া তাঁহার নিত্য অতিথি পাখিগুলিকে দিবেন (কাঠবিড়ালীর জন্য খাবার অপর পাত্রে আসিত, তবে পাখিদের মধ্যে কাঠবিড়ালীরাও ঐ খাদ্যের ভাগ গ্রহণ করিত)। কয়েকটি সিদ্ধ করা পাকা খেজুর, কয়েক টুকরা মিছরী, একটু দুধ ও চা (উল্লিখিত কয়েকটি জিনিস প্রতিদিনই থাকিত)। প্রথমে পাখিগুলিকে খাবার না দিয়া তিনি নিজে খাইতেন না। সেইদিনেও তাহার অন্যথা হইল না। জলযোগের পর তিনি একটু বেশি শীত অনুভব করিতে লাগিলেন। দুই-একখানা মোটা কম্বল দিয়া তাঁহাকে বেশ ভালো করিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইল। তাঁহার পরিহাস-প্রিয়তা প্রসিদ্ধ; আমরণ ইহা ছিল। বলিলেন, 'দেখ, আমি ভাল্লুক, Polar Bear হইয়াছি।' তাহার পরেই উচ্চ হাস্য।

এখানকার 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় তাঁহার একটা কবিতা ছাপা হইতেছে। এই কবিতাটি তিনি তিন-চার দিন পূর্বে রচনা করিয়াছিলেন। ছাপাখানা হইতে প্রুফ আসিয়াছিল। তিনি তাহা তখন শোধন করিয়া দিলেন। ইহার পর তিনি একটি কবিতা লেখেন। শেষ অবস্থায় তিনি নিজে আর লিখিতে পারিতেন না, তিনি বলিতেন আর অনিলবাবু তাহা লিখিয়া রাখিতেন। এই-সব কাজের জন্য অনিলবাবু তাঁহার নিকট রাতদিন থাকিতেন। ঐ কবিতা দুইটির কথা পরে আবার উল্লেখ করিব।

সেদিন তিনি অন্য কিছু আহার না করিয়া কেবল ফল, দুধ ও চা খাইলেন। অন্যান্য দিন রাত্রি একটু বেশি হইলে তিনি ঘুমাইতেন, কিন্তু সেদিন সাতটার সময়েই বলিলেন যে, আজ একটু শীঘ্র শীঘ্র ঘুমানো যাউক। এই বলিয়া তিনি বসিবার জায়গা হইতে উঠিয়া বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িলেন।

রবিবার দিন-রাতের মধ্যে এমন কিছুই বোঝা গেল না যে, তাঁহার কোনোরূপ পীড়া হইয়াছে। সোমবার প্রত্যুষে স্নানাদি সমস্তই নিয়মমত হইল। বারান্দায় বসিবার স্থান করিয়া দেওয়া

হইল। আজ তিনি জলযোগের সময় কেবল দুধ ও চা পান করিলেন। শীতটা খুব বেশি বোধ হওয়ায় ঘরের মধ্যে আসিয়া বসিলেন। তাহার পর তিনি একটি কবিতার কিছু কিছু পরিবর্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনিলবাবু কাছে ছিলেন, তিনি তাহা লিখিয়া লইলেন। তখনো তাঁহাকে অসুস্থ বলিয়া মনে হয় নাই। সেদিন তিনি দুধ ও ফলের রস[১] ছাড়া অন্য কোনো খাদ্য গ্রহণ করিলেন না। শরীরটা ক্রমশ অসুস্থ বোধ হইতে লাগিল। তিনি তখন খাটে শুইয়া পড়িলেন। বেলা তিনটা। দেখা গেল একটু জ্বর হইয়াছে। চারটার সময় ডাক্তার আসেন। ডাক্তারকে পরীক্ষা করিতে দেওয়া তাঁহার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। ডাক্তারী চিকিৎসাকে তিনি ভালোবাসিতেন না। তথাপি অনেকের অনুরোধে সম্মত হন ; কিন্তু বলেন যে, তিনি কোনো ঔষধ খাইবেন না। হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করিয়া জানা গেল তাঁহার বাম দিকের ফুসফুস-প্রদাহ (নিউমোনিয়া) হইয়াছে। একটা মালিশের ও একটা খাইবার ঔষধের ব্যবস্থা হইল। আমাদের আশ্রমের আরোগ্যশালায় (হাসপাতালে) একটা ঔষধ না থাকায়, তাহা আনিবার জন্য বোলপুরে লোক পাঠানো হইল। তাহার আসিতে একটু বিলম্ব হয়। সন্ধ্যা হইয়া গেল। নিজেই তখন তিনি মালিসের ঔষধটা আসিয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করেন। যখন বলা হইল যে তখনো তাহা আসে নাই— শীঘ্রই আসিতেছে, তিনি তখন বলিলেন, ‘তবেই দফা রফা!’ তখনো কেহ বুঝিতে পারে নাই যে, অত শীঘ্র তাঁহার শেষ হইবে। মাথায় একটু বেদনা বোধ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পর একবার ভেদ হয়। কিন্তু তাহা অস্বাভাবিক নহে। মাঝে মাঝে এইরূপ হইত। এই সময় তাঁহার পিপাসা দেখা গেল। এবং ঘন ঘন কমলা-লেবুর রস চাহিয়া খাইতে লাগিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে হাত-পা

১ তিনি বহুদিন হইতেই গোটা ফল খাইতেন না, সমস্ত ফলেরই রস করিয়া তাঁহাকে দেওয়া হইত।

টিপিয়া দিবার কথা বলিতেছিলেন। কিন্তু কোনো যন্ত্রণার কথা বলেন নাই। তিনি যন্ত্রণা পাইলেও কখনো তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতেন না, এইরূপ তাঁহার তিতিক্ষা ছিল। রাত্রি বারোটার সময় একবার মাথা টিপিয়া দিতে বলেন। কিন্তু তখনো বিন্দুমাত্র উদ্‌বেগ প্রকাশ করেন নাই। যাঁহারা তাঁহার পাশে ছিলেন তাঁহাদিগকে ঘুমাইতে বলিলেন, 'যাও তোমরা ঘুমাও, রাত জাগিলে ব্যামো হইবে।' রাত্রি দুইটার সময় তাঁহার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ইহার পরেও তিনি নিজে চাহিয়া ফলের রস পান করেন। কিন্তু তাহার পর আর কথা বলেন নাই, বা কোনো উদ্‌বেগও প্রকাশ করেন নাই, শান্তভাবে ঘুমাইয়া পড়িলেন। রাত্রি তিনটা। একটু শ্বাস দেখা গেল। ইহাতে বুঝা গেল তাঁহার অবস্থা খারাপ। কেহ বুঝিল, কেহ বা বুঝিতেই পারিল না। প্রায় চারটার সময় তিনি অতি ধীর ও শান্ত ভাবে মহানিদ্রায় মগ্ন হইয়া পড়িলেন। দেখিয়া মনে হইতেছিল, তিনি স্বাভাবিকভাবে ঘুমাইতেছেন, কোনো বিকার নাই। মুখের জ্যোতি অম্লান। আশ্রমের কয়েকটি মাত্র লোক ছাড়া আর কেহই সেই রাত্রে এ সংবাদ জানিতেও পারিল না।

পরদিন সূর্যোদয় হইতে-না-হইতে আশ্রমের অধিবাসী আবাল-বৃদ্ধ সমস্ত নরনারী আমলকী-কুঞ্জে দলে দলে আসিয়া তাঁহার পদতলে প্রণত হইল।

তাঁহার সুবৃহৎ পরিবারবর্গের অনেকেই এ-সময় উপস্থিত ছিলেন না। কেবল তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রবধু শ্রীমতী হেমলতা দেবী, পৌত্র শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার সহধর্মিণী শ্রীমতী কমলা দেবী তাঁহার পার্শ্বে ছিলেন। ইঁহারা আশ্রমেই বাস করেন। পরে সংবাদ পাইয়া তাঁহার দুই পুত্র শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত কৃতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহাদের ধর্মপত্নীদ্বয় প্রভৃতির সহিত কলিকাতা হইতে আগমন করেন। গুরুদেবও এখানে ছিলেন না। তিনি শ্রীমান রথীন্দ্রনাথ প্রভৃতির সহিত লখনৌ গিয়াছিলেন।

বেলা আড়াইটার সময় তাঁহার শব বহন করিয়া সপ্তচ্ছদ বেদীর

নিকট লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে সপ্তচ্ছদ ও আমলক তরুর ছায়ায় তাঁহার স্বরচিত অতি প্রিয় গানটি তিনবার গাওয়া হয়। সেই গানটি এই :

কর তাঁর নাম গান ; যতদিন রহে দেহে প্রাণ।
যাঁর হে মহিমা জ্বলন্ত জ্যোতি, জগত্‌ করে হে আলো,
স্রোত বহে প্রেম-পীযূষ-বারি সকল-জীব-সুখকারী হে।
করুণা স্মরিয়ে তনু হয় পুলকিত, বাক্যে বলিতে কি পারি ?
যাঁর প্রসাদে এক মুহূর্তে সকল শোক অপসারি হে।
উচ্চে নীচে, দেশ-দেশান্তে, জলগর্ভে, কি আকাশে,
অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর, এই সদা সবে জিজ্ঞাসে হে।
চেতন-নিকেতন, পরশ-রতন সেই নয়ন-অনিমেষ,
নিরঞ্জন সেই, যাঁর দরশনে নাহি রহে দুঃখ-লেশ হে॥

এ গান সেদিন অত্যন্ত মর্মস্পর্শী হইয়াছিল। অনেকেরই হৃদয় ইহাতে গলিয়া উঠিয়াছিল।

বেলা চারটার সময় এক বিশাল চিতার উপর তাঁহার শব স্থাপন করা হইল। সুধীন্দ্রনাথ কাঁপিতে কাঁপিতে দুর্বলহস্তে চিতায় অগ্নি-সংযোগ করিলেন। ক্রব্যাদ অগ্নি বিপুল ও চঞ্চল জিহ্বা বিস্তার করিয়া সমস্ত কবলিত করিয়া ফেলিল! দেখিতে দেখিতেই পঞ্চ-ভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া গেল।

মৃত্যুর সময় অনেকে অনেক কথা বলিয়া যান। বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন : ভিক্ষুগণ, কারণ-সংযোগে যাহা উৎপন্ন হয় তাহা অনিত্য, তোমরা সাবধান হইয়া চল। মহারাজা অনন্তযশ বিপুল ঐশ্বর্যের অধীশ্বর ছিলেন। মৃত্যুর সময় প্রজারা যখন তাঁহার এক অধীন ও প্রিয় রাজাকে সম্মুখে করিয়া নিবেদন করিয়াছিলেন, 'মহারাজ, লোকে যখন আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে যে, মহারাজ অনন্তযশের সুভাষিত (ভালো কথা) কি ? তখন আমরা কি উত্তর দিব ?' তিনি তখন বলিয়াছিলেন : অনন্তযশের বিপুল ঐশ্বর্য ছিল,

তিনি ইন্দ্রের অর্ধাসন লাভ করিয়াছিলেন। যখন যাহা উপভোগের ইচ্ছা হইয়াছিল, তখনই তাহা পূর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি তাঁহার-কামনার তৃপ্তি হয় নাই। তিনি অতৃপ্ত থাকিয়াই মৃত হইলেন। তোমরা বলিও, মহারাজ অনন্তযশের ইহাই সুভাষিত।

দ্বিজেন্দ্রনাথ শেষ সময় কি বলিয়া গেলেন ইহা জানিবার ইচ্ছা অনেকেরই হইতে পারে। ঐ প্রশ্নের উত্তর, তিনি কিছুই বলিয়া যান নাই, তিনি অনেক বলিয়া গিয়াছেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি মৃত্যুর পূর্বে সাধারণ আবশ্যক বিষয় সম্বন্ধে যৎসামান্য কিছু ভিন্ন তিনি অপর কিছু বলেন নাই। কিন্তু সেইদিন ও তাহার পূর্বদিনে নিজের রচনা লইয়া যে আলোচনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে অনেক ও শেষ কথা বলিয়া গিয়াছেন।

পূর্বে তাঁহার প্রিয় গানটির উল্লেখ করিয়াছি। আমাদের আশ্রমে প্রতি বৎসর ৭ই পৌষের উৎসবে এই গানটি শেষে গাওয়া হয়। এই কয়দিন আমাদের শিশু-বিভাগের ছেলেরা তাহাদের ইচ্ছানুসারে সন্ধ্যার পর প্রায় তাহা গাইতেছে। তাহাদের কণ্ঠস্বর বেণুকুঞ্জেও আসে।

তাঁহার জীবন যে সেই সুরে গাঁথা ছিল তাহা সুস্পষ্টভাবে আমি লক্ষ্য করিয়াছি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় দ্বিপেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর হইতে। তাঁহাকে বহু-বহুবার বলিতে শুনিয়াছি, ভগবান যে তাঁহাকে কত করুণা করিয়াছেন তাহা তিনি বলিয়া শেষ করিতে পারেন না। যৌবনে তিনি একবার তাঁহার করুণার বিমলানন্দের উপলব্ধি করেন, পরে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে আবার তিনি তাহা লাভ করেন। ইহা তিনি নিজেই প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তিনি এমন এক শান্তি লাভ করিয়াছেন যাহার পরে আর কিছুই প্রার্থনীয় হইতে পারে না। কিছুদিন হইতে তাঁহাকে প্রধানত আধ্যাত্মিক বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে দেখিয়াছি। অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিতেন, কিন্তু তাহা খুব কম। পূর্বে বলিয়াছি রবিবার দিন তিনি একটি কবিতার প্রুফ সংশোধন করেন। ইহা

তিন-চার দিন পূর্বের রচনা। মৃত্যুর নিকটের দিনে তিনি কি অনুভব করিয়াছিলেন তাহা ইহা দ্বারা বুঝা যাইবে :

দ্বি জে র ত্রি জ ত্ব

কী দেখছি এ ! কী করুণা ! কী প্রেম ! কী স্নেহ !
কারো প্রতি কারো এত করুণা দেখে নাই কভু কেহ।
যে যন্ত্রণা সহিনু আমি বাঁধা পড়ি গিয়া করমে।
ছাড়িব না চরণ প্রভু, ছাড়িব না কোন জনমে।
জ্বলিতেছিল হৃদে মোর তাপানল অনিবার।
নাই ঠাঁই আজিকে সেথা আনন্দ রাখিবার।
দেখা দিলে যেই নয়নে মোর বাঁধা পড়ি গেল দিঠি।
যত কিছু ছিল মনের সাধ নিমেষে গেল মিটি।
পাষাণে অঙ্কুরে বীজ করুণাধারায় তব।
ত্রিজ হ'ল দ্বিজ এ দীন জনম লভিয়া নব।

ইহার পরেও আর কিছু কি শুনিবার থাকিতে পারে? রবিবারে তিনি আর-একটি কবিতা রচনা করেন বলিয়াছি, ইহা মুণ্ডক উপনিষদের দুইটি শ্লোকের (৩, ১, ১-২) অনুবাদ :

এ ক বৃ ক্ষে দু ই প ক্ষী

সুন্দর দুটি পক্ষী থাকে সখ্যে মিলি এক বাসবৃক্ষে।
একটি খায় স্বাদু ফল না খাইয়া অন্যটি নিরিক্ষে॥
'দীন আমি' বলি' শোচে ভোক্তাটি, শোক তার ঘুচি যায়,
মহিমা আপন সখা পাখিটিতে দেখিবারে যবে পায়।

৪ঠা মাঘ সোমবার মৃত্যুর দিন। বলিয়াছি এ দিনেও তিনি একটি কবিতার কিছু পরিবর্তন করেন। সেই কবিতাটি এই :

উথলে বিশ্ব তোমার অনুপম আনন্দ হইতে।
আনন্দে রহিবে নর-নারী সবে তোমার সহিতে—

ইহা চেয়ে মঙ্গল কি আছে আর এ ভব-সংসারে।
সাবাস মন্দ ভীম তপা, যে-আনন্দে বধি' মারে॥
ভীষ্ম কৈলা শরশয়ন না-জানি কী ফলের লোভে।
ভাবিয়া দেখিলে শকুনির মত পাপীকেই তাহা শোভে
মুখ শিট্‌কান বিকট মূরতি দেখিলে উপজে ভয়।
তপস্য ততটুকুই ভাল যতটুকু দেহে সয়॥
কাজ নাই তপস্যা আমার আনন্দ আমি চাই।
হেরিলে তোমার আনন্দরূপ কত না সুখ পাই॥
তোমার আনন্দে করি ধ্রুবতারা ভাসাই তরণী।
দুর্দিনে পাইলে ভয় তুমি হও দিনমণি॥
মাথায় করি লব যবে তুমি পাঠাইবে মরণ।
মরণে সে ডরে না কভু রহে যে ধরি চরণ॥

পূর্বে বলিয়াছি তিনি শান্তভাবে চলিয়া গিয়াছেন। কিরূপে তাঁহার সেই শান্তভাব সম্ভব হইয়াছিল তাহার কারণ এই কবিতাতেই রহিয়াছে :

মাথায় করি লব, যবে তুমি পাঠাইবে মরণ।
মরণে সে ডরে না কভু রহে যে ধরি চরণ॥

তাহাই বলিতেছিলাম, শেষ সময়ে তিনি কিছুই বলিয়া যান নাই, তিনি অনেক বলিয়া গিয়াছেন।

১২ মাঘ ১৩৩২
শান্তিনিকেতন

বিধুশেখর ভট্টাচার্য

শ্বশুরমহাশয়

পূজ্যপাদ শ্বশুরমহাশয় কি ধাতের মানুষ ছিলেন এক কথায় তার সম্যক চিত্রটি ফুটিয়ে তুলতে পারা সহজসাধ্য নয়। তাঁর অসাধারণত্ব, গুণ ও শক্তির খণ্ড পরিচয় চারি দিকে ছড়িয়ে আছে এত বেশি যে সেগুলিকে একত্র শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত করে তোলা একজনের পক্ষে অসাধ্য কাজ। যিনি যেভাবে যখন তাঁকে দেখেছেন, নিজের নিজের মনের দৃষ্টিতে তাঁর যে রূপ যখন তাঁদের কাছে যেমনটি প্রতিফলিত হয়েছে, সেইটুকু যদি তাঁরা নিজের ভাবে ফুটিয়ে লেখেন তবে সেই খণ্ড পরিচয়গুলি একত্র হয়ে একটি সমগ্রতার রূপ নিতে পারে।

শ্বশুরমহাশয় যে ধাতের মানুষই হোন-না কেন তিনি যে সকল দিকে ষোলো-আনা খাঁটি মানুষ ছিলেন এতে কোনো ভুল নাই। তাঁর ঈশ্বরভক্তি ছিল খাঁটি, পিতৃভক্তি ছিল খাঁটি, ভাইদের ও সন্তানদের প্রতি স্নেহ ছিল খাঁটি। স্বদেশপ্রীতি, বন্ধুপ্রীতি ও জীবপ্রীতি ছিল তাঁর খাঁটি। দার্শনিক তত্ত্বের বিচার ও বিশ্লেষণে অনুরাগ ছিল খাঁটি। কাব্যে প্রীতি ও বাংলা ভাষার প্রতি দরদ ছিল খাঁটি। ভাষার এলোমেলো আলগা ব্যবহার সইতে পারতেন না একটুও।

তিনি সেজেগুজে বসে বাইরের ঠাট বজায় রাখতে জানতেন না আদৌ। সাজিয়ে কথা বলতে পারতেন না একটিও, তাই ঠকত না কেউ তাঁর কথায় ও কাজে কখনো।

তাঁর প্রকৃতির একটি বৈশিষ্ট্য ছিল ধ্যানপরায়ণতা। যেন সহজাত সংস্কারের মতো ধ্যানের অভ্যাসটি ছিল তাঁর আয়ত্তীভূত---এটি অনন্যসাধারণ। অতি সহজে তিনি ধ্যানমগ্ন হয়ে যেতেন। অন্তরে তিনি ধ্যানী মানুষ কিন্তু বাহিরের কথা কাজ ও ভাব ছিল ছেলেমানুষের বাড়া। আবদারে ছেলেমানুষের প্রতিমূর্তি, অসহিষ্ণুতার অবতার বললে তাঁকে অত্যুক্তি হয় না। যখন যে জিনিস চাই সেই মুহূর্তে সেটি না পেলে বাড়ির কারো রক্ষা ছিল না, হুলুস্থুল বাধিয়ে

তুললেন তদ্দণ্ডে। শিশুপ্রকৃতি শ্বশুরমহাশয়ের শখ ছিল সামান্য, তাই চাওয়াও ছিল তাঁর যৎসামান্য। খাতা-কাগজ, কলম-পেন্সিল, খানকতক তত্ত্বজ্ঞানের গ্রন্থ, কাগজের বাক্স তৈরির জন্য রাশখানেক ব্রাউন পেপার— এই ছিল তাঁর চাওয়ার মধ্যে সর্বপ্রধান। তাঁর দিনযাত্রার এরাই ছিল সঙ্গী।

জ্যামিতির অনুশীলন ছিল তাঁর মস্তিষ্ক খাটানোর একটি দৈনন্দিন কাজ। জ্যামিতির মাপ ও হিসাব অনুসারেই তিনি বাক্সতৈরির কাগজগুলি ভাঁজ করতেন। সুতরাং বাক্সতৈরির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জ্যামিতির অনুশীলন করাও হত। জ্যামিতির হিসাব জড়িত থাকত বলেই সহজে কেউ বাক্স তৈরি শিখে উঠতে পারত না। জিওমেট্রির নামানুসারে তিনি বাক্স তৈরি কাজের নাম রেখেছিলেন "বক্সোমেট্রি"— এই ছিল তাঁর শখের একটি ব্যাপার। আর-একটি শখ ছিল বাংলায় সাংকেতিক অক্ষর শর্টহ্যাণ্ড সৃষ্টি করা। এই কাজের সূত্রে তিনি ছড়ার মতো যে-সব কবিতা লিখে গেছেন সেগুলি বাংলা ভাষায় একটি অপূর্ব জিনিস। নমুনাস্বরূপ ল বর্ণের দুই ছত্র এখানে উদ্ধৃত করা হল—

শিল্লীবধূ ফুলকুমারী
আলতা পরি পায়
কল্কা পেড়ে হলদে শাড়ী
বাগিয়ে পরে গায়
যেই শুনিল পাল্কী এল
অমনি তাড়াতাড়ি
ভেল্কিবাজী দেখতে পেল
বেলফুলের বাড়ী।

ছড়ার আকারের সেই কবিতাগুলি তিনি যে কতবার কতরকমে পরিবর্তন করেছেন বলে শেষ করা যায় না। শেষ পর্যন্ত তাঁর এই শখ মেটে নি। তিনি রেখাক্ষর সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি।

ভবিষ্যতে হয়তো সেগুলি কাজে লাগতেও পারে যদি কেউ বাংলায় সাংকেতিক অক্ষরের প্রচলন ও উন্নতি করতে চান।

শ্বশুরমহাশয়ের বালকোচিত স্বভাবের বহুল দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। এখানে দু-একটির উল্লেখ করি। হঠাৎ হুলুস্থূল হাঙ্গামা, চেঁচামেচি, গোলমালের শব্দ শোনা গেল। চাকররা ছুটোছুটি করছে, শ্বশুরমহাশয়ের চশমা পাওয়া যাচ্ছে না। তলব এল আমার কাছে, বাবামশায় ডাকছেন শীঘ্র আসুন, তাড়াতাড়ি গিয়ে দাঁড়ালুম সামনে। দেখেই বললেন, চাকরদের কাণ্ড দেখ বউমা, আমার জিনিসপত্তর কিছুই গুছিয়ে রাখবে না, সামলাবে না কোনো-কিছু, কেবল উপরের দিকে চোখ তুলে শিবনেত্র হয়ে ঘুম লাগাবে। টেবিলে হাত ঠুকছেন আর বলছেন আমার চশমাটা কোথায় গেল হাতড়ে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না, বলো তো এখন আমি কি করি, কি করে লিখি, কি করে পড়ি, চশমা নইলে আমার এক দণ্ড চলবে না। চাকরদের কাণ্ড—দামী চশমাটা আমার হারিয়ে ফেলল, খোঁজো তো তুমি একবার যদি পাও। কাগজপত্তর খাতা ইত্যাদি উল্টে পাল্টে অনেক খোঁজা গেল, কোথাও চশমা নেই। শেষে বাবামশায়ের মুখের দিকে চেয়ে দেখি, চশমা তাঁর চোখেই লাগানো রয়েছে। সেদিকে কারো নজর পড়ে নি এতক্ষণ, তাঁরও সেটা খেয়াল ছিল না। মাথা হেঁট করে বললুম, বাবামশায়, চশমা আপনি চোখেই পরে আছেন। তাই নাকি— ব'লে হাত দিয়ে চশমাটা ঠিক জায়গায় রয়েছে দেখে উচ্চৈঃস্বরে হাসি আরম্ভ করলেন। হাসির চোটে ঘণ্টাব্যাপী চেঁচামেচির ঝাঁজ মুহূর্তে কর্পূরের মতো গেল উবে। খুশির হাল্কা হাওয়ায় ঘর উঠল ভরে। বললেন, আচ্ছা যা হোক! তোমাকে ব্যস্ত করে তুললুম, যাও, সংসারের কাজকর্ম দেখ গে। যাই হোক, তুমিই তো শেষ পর্যন্ত চশমাটা খুঁজে বার করলে— ব'লেই আবার হাসি।

ভোরে স্নান করা তাঁর চিরদিনের অভ্যাস। জ্বর হয়েছে, আগের দিন তাপযন্ত্রে উত্তাপ ১০৪ ডিগ্রি উঠেছে। সকলেই ব্যস্ত, বাবামশায়

নিশ্চিন্ত, কবিতা আওড়াচ্ছেন, আমাকে ধরে বসিয়ে কবিতা লেখাচ্ছেন বেপরোয়া ভাবে। ভোরের সময় স্নানটা সামলাতে হবে সকলের সেই দিকে চিন্তা, নিষেধ করা চলবে না, তা হলে জিদ বাড়বে। রাতে চাকরকে বলে রাখা হল, দেখিস যদি ভোরে স্নানের জন্য উদ্যোগী হন তাড়াতাড়ি খবর দিস, এসে পড়ে যদি থামানো যায় চেষ্টা করা যাবে। যথাসময়ে স্নানে উঠছেন, গতিক বুঝে তাড়াতাড়ি চাকর এল লুকিয়ে খবর দিতে। মানুষের সাড়া পেয়ে মুহূর্তের মধ্যে জলভরা প্রকাণ্ড বড়ো একটি টবের মধ্যে ঝুপ করে গিয়ে বসে পড়লেন বাবামশায়, পাছে লোক এসে স্নানের বিঘ্ন ঘটায় ভেবে। স্নানশেষে কম্বল মুড়ি দিয়ে অভ্যস্ত নিয়মে খোলা বারান্দায় গিয়ে বসলেন যেন অসুখের চিহ্নমাত্র নেই শরীরে এমনিতর ভাবখানা। আমাদের মুখের ভীত ও চিন্তিত ভাব দেখে বললেন, রোগের জন্যে ভাবো কেন, আমি নিজের চিকিৎসা নিজে খুব ভালো জানি। বদ্যি ডেকে নাড়ী টেপাবার কোনো দরকার নেই। ঔষধপথ্য সব আমার নিজের মতে চলবে। যাও, খিচুরি তৈরি করো গিয়ে। চায়ের পেয়ালা বসাবার এক নূতনতর কায়দা ছিল বাবামশায়ের--- একখণ্ড কাঠের মাঝখানটা গর্ত করে তাতেই পেয়ালা বসানো থাকত। পিরীচের উপর পেয়ালা রেখে চা খেতেন না কোনো দিন। ভালো লাগার এই-সব নূতনত্ব ছিল তাঁর সকল ব্যাপারে। ভোরের বেলা বেড়াবার সময় পা ফেলতেন সংখ্যা গুণে। সেই সময় সামনে গিয়ে কেউ কোনো কথা বলে সংখ্যা গণনায় বাধা ঘটালে চটেমটে ব'লে উঠতেন, জ্বালালে দেখছি, আবার গোড়া থেকে গুণতে হবে। কাণ্ডজ্ঞান নেই তোদের, এ সময় আসিস কেন?

দু-বেলা খাবার সময় একটা-না-একটা গোলযোগ লেগেই থাকত। কখন কি খুঁত বেরোয় ভয়ে সকলকে তটস্থ থাকতে হ'ত। মোচার ঘণ্ট মুখে দিয়ে গরম-মসলার গন্ধ পেলেই হুলুস্থুল—কোথা থেকে কতকগুলো মাথা-ঘষা বেঁটে মোচার ঘণ্টে ঢুকিয়েছে। কিচ্ছু জান না কি করে রাঁধতে হয়। লেখাপড়া শিখছে সব মাথা আর

মুণ্ডু। আমার ঠাকুরমা দিদিমা কি রকম মোচার ঘণ্ট রেঁধে খাইয়েছেন, তেমনটি আর খেলুম না। তোমরা তেমন চক্ষেও কখনো দেখ নি।

বৈকালে গরম লুচি ভেজে সামনে এনে দিয়েছি। লুচিতে হাত ঠেকিয়েই বললেন, একি লুচি, ঘি চপচপ করছে লুচির সারা গায়ে, আমার হাত সুদ্ধ নষ্ট হ'ল ঘি লেগে। লুচির প্লেট আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, যাও, জল দিয়ে লুচি ভেজে আনো। ঘি দিয়ে বুঝি আবার লুচি ভাজে। লুচির প্লেট হাতে নিয়ে ঘরের বাইরে এসে চাকরকে ঘি দিয়ে লুচি না বেলে তুটি শুকনো ময়দা দিয়ে বেলে লুচি ভেজে আনতে বলা হ'ল। চাকর ভেজে নিয়ে এল লুচি। এবার ঠিক হয়েছে দেখা গেল। লুচির গায়ে ঘি লেগে নেই একটুও। লুচি দেখে বাবামশায় খুব খুশি; বললেন, এই তো ঠিক হয়েছে, দেখলে জল দিয়ে ভেজে কেমন হ'ল। খাওয়ার শেষে আস্তে আস্তে গল্পছলে বলতে হ'ল, ফুটন্ত গরম জলে কাঁচা ময়দা বেলে ছেড়ে দিলে ময়দার কাই হয়ে যাবে, লুচি হবে না। ঘিয়েতেই লুচি ভেজে এনেছে সামান্য একটু রকমফের ক'রে। বাবামশায়ের তখন হুঁশ হ'ল; বললেন, তাই তো, গরম জলে ময়দা দিলে গুলে কাই হয়ে যাবে তো বটেই। আচ্ছা কাণ্ড আমার, কি বলতে কি বলি, তোমাদিকে জ্বালিয়ে মারি। তোমরা যা ভালো বোঝো তাই করো —ব'লেই সেই পাড়া-জাগানো হাসি আবার শুরু হ'ল।

এই ভাবের শ্বশুর নিয়ে সংসার করতে হয়েছে আমাদিকে। আত্মভোলা-মানুষের মর্মকথা বোঝা গিয়েছে এই-সব মানুষের সংস্পর্শে এসে। একটা বিষয়ে নিবিড় তন্ময়তা অন্য পাঁচটা বিষয়ে অন্যমনস্ক ক'রে রাখত বাবামশায়কে সকল সময়। ধ্যানপরায়ণ চিত্তের এটি বাহ্য লক্ষণ বলা যেতে পারে। লক্ষ্যবস্তুর প্রতি অনুরাগের ঐকান্তিকতাতেও এরূপ ঘটে থাকে। সূক্ষ্মতত্ত্ববিচারে তাঁর মন কখনো অসতর্ক হ'ত না। নিখুঁৎ ভাবে তিনি তত্ত্বনির্ণয়ে পারদর্শী ছিলেন। আশ্চর্য তত্ত্বদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন তিনি। যে ঘনিষ্ঠভাবে

তাঁর সঙ্গে থেকেছে, মিলেছে— সেই এ-কথার সত্যতা জানে।

এই গভীর শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন অসাধারণ পণ্ডিত পত্নীবিয়োগে কি নিদারুণ মর্মব্যথা পেয়েছিলেন, সেই সময়ে তাঁর রচিত দু-একটি গানে তার নিদর্শন পাওয়া যায়—

"গভীর বেদনা, অস্থির প্রাণ, কর হে আমারে শান্তি দান।"

গানটি তাঁর ঐ সময়ে রচিত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মসংগীত গ্রন্থের একটি সংস্করণে উক্ত গানটি পূজনীয় রবীন্দ্রনাথের ব'লে নির্দেশ করা হয়েছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গানটি পূজ্যপাদ শ্বশুর-মহাশয়ের রচিত।

অসংসারী শ্বশুরের সংসারে সংসার করেছি আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন থেকে। কর্তৃত্বস্পৃহাশূন্য কর্তার ঘরে বাস করেছি নিজের কর্তা নিজে হয়ে।

মৃত্যুর বছর-দুই আগে তিনি নিয়ত ভগবৎ-চিন্তায় ডুবে থাকতেন। আলাপ করতেন কেবল ভগবৎ-বিষয়ে। দেহান্ত হয় তাঁর ১৩৩২ সালের ৪ঠা মাঘ। ঐ সালের ২৯শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার, তিথি অমাবস্যা, সকাল ৭-১৯-১৫ সেঃ মধ্যে অন্তরে তিনি একটি ঐশ্বরিক আবির্ভাব উপলব্ধি করেন। যেন দেহের বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল, আত্মা অনুভূত হলেন দেহ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে। সেইদিন জানলুম, ঈশ্বরপরায়ণ, জ্ঞানবৃদ্ধ, স্বভাবশিশু, বিষয়ভোলা, প্রকৃতির কোলঘেঁষা, একান্ত সরল মনের আশ্চর্য মানুষ বাবামহাশয়।

চৈত্র ১৩৪৬ হেমলতা ঠাকুর

প্রসঙ্গকথা

এই গ্রন্থের ৭০-৭১ পৃষ্ঠায় শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ও কর্মীদের সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথের যে কবিতা উল্লিখিত ও অংশতঃ উদ্ধৃত হয়েছে, পরিশিষ্ট ১-এ সেই কবিতাটি ১৩২৬ সালের পৌষ সংখ্যা শান্তিনিকেতন পত্র থেকে সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রিত হল। এই কবিতায় যাঁরা সংক্ষেপে উল্লিখিত হয়েছেন তাঁদের পরিচয়—

দ্বিজ	দ্বিজেন্দ্রনাথ
বিধু	বিধুশেখর শাস্ত্রী
রবি	রবীন্দ্রনাথ
নৃপাল	নেপালচন্দ্র রায়
ক্ষিতিমোহন	ক্ষিতিমোহন সেন
জগদানন্দ	জগদানন্দ রায়
রথী	রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
দিনু	দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
দ্বিপ	দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর
হরিচরণ	হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
সন্তোষ	সন্তোষচন্দ্র মজুমদার
কালীমোহন	কালীমোহন ঘোষ
সুধাকান্ত	শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী
ভীমরাও	ভীমরাও শাস্ত্রী
অনিল	অনিলকুমার মিত্র
প্রমদারঞ্জন	শ্রীপ্রমদারঞ্জন ঘোষ
প্রভাত	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
নগেন্দ্র	নগেন্দ্রচন্দ্র আইচ
উপেন	উপেন্দ্রনাথ দত্ত
ধী-মু.	ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
গোরাচাঁদ	গৌরগোপাল ঘোষ
সুরেন	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর
তেজেশ	তেজেশচন্দ্র সেন

দ্বিজেন্দ্রনাথ যে অনেক সময় কবিতায় চিঠি লিখতেন, এই পুস্তকের ৭০ পৃষ্ঠায় তার উল্লেখ আছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর সেক্রেটারি অনিলকুমার মিত্রকে কবিতায় এই-রকম যে-সব চিঠি লিখেছিলেন পরিশিষ্ট ১-এ 'অনিলগ্রস্ত পদাবলী'তে তার কতকগুলি সংকলিত হল।

দ্বিজেন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের পর, তাঁর একান্ত অনুরাগী পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় ১৩৩২ সালের ভারতী পত্রে যে-বিবরণ লেখেন পরিশিষ্ট ২-এ সেটি মুদ্রিত হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রবাসী পত্রের চৈত্র ১৩৪৬ সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বিশেষ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়; সেই সংখ্যায় মুদ্রিত দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্রবধূ, দ্বিপেন্দ্রনাথের সহধর্মিণী হেমলতা দেবীর রচনাটি এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট ২-এ সংকলিত হল।

—